OMKAR

GARGI
BHATTACHARYA

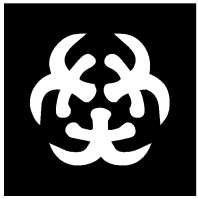

COPYRIGHTED MATERIAL

ওঙ্কার

গার্গী ভট্টাচার্য

This is my humble tribute to the great Yogi Sri Aurobindo Ghose

And this photo is taken during his MAHASAMADHI

মহারাজ-জী -কে ,

আদি, শয়তানের দিকে নয় , সত্যের দিকে থেকো

!!

The scars of others should
teach us caution.

St. Jerome

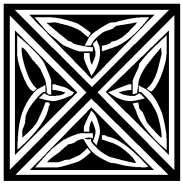

My website :

www.gargiz.com

Thanks to Bangladeshi journalist Salauddin Suman for his video on Auroville .

My semi autobiography in 3 parts has been downloaded more than 60 million times .

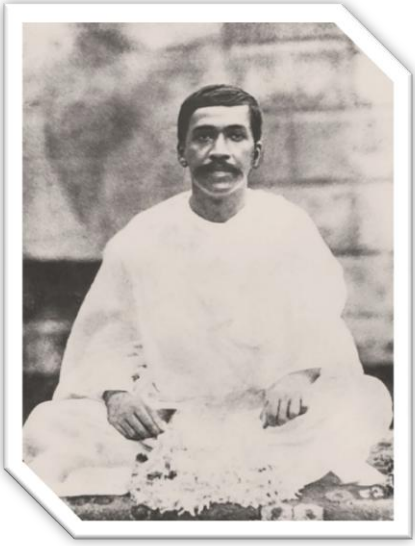

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !!

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ওঙ্কার

ওঙ্কার বিহরণের গল্প ; বাংলা টুইট । গুগুশের টুইট ।গুগুশ হল শিরিনের ডাকনাম । সে হল তাদের পরিবারের রাজহংস/কোকিল ইত্যাদি ।বড় আদরের। শিরিন একজন মুসলিম মেয়ে যে ভারতে এসেছে বেড়াতে । নানান প্রদেশ ঘুরে দেখেছে । তার মধ্যে এই অংশটি লেখা পন্ডিচেরি ও থিরুভান্নামালাই নিয়ে । সে জাতে ইরানী তাই বাংলা শিখে নিয়ে এই ভাষায় লিখছে কারণ তার--- শ্রী অরবিন্দের প্রতি অশেষ ভক্তি ও ভালোবাসা। সে ওনাকে বাবা বলে সম্বোধন করে ।

মুসলিম হলেও ধর্ম নিয়ে কোনোদিন মাতামাতি করেনি । রোজা করা বা নমাজ পড়াও করেনি নিয়মিত । বাসাতেও এই নিয়ে কোনো চাপাচাপি ছিলো না কারণ তার পিতা ছিলেন মুক্তমনা ও ঋষি

অরবিন্দের ভক্ত । সুদূর ইরান থেকে আসেন পন্ডিচেরি । অনেক গল্প শুনেছিলো বাবার কাছে । সেই নিয়েই এই বই বা টুইট লিখতে বসেছে । ও একে বই বলেনা , টুইট বলে । তার কারণ ও যা শুনেছে তার কোনো প্রমাণ ও নিতে যায়নি । বাবার কাছে যা শুনেছে সবই আধ্যাত্মিক গল্প কাজেই সবকিছুর প্রমাণ হয়না কিংবা দেওয়া চলেনা অথচ আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে সবার কাছে প্রমাণ ও যুক্তি চায় আর না পেলে জেলে পুড়ে দেয় । শিরিন জেলকে খুবই ভয় পায় বিশেষ করে তিহার জেলকে যেখানে ইয়া ইয়া উগ্রপন্থীরা থাকে । ও তো আর শ্রী অরবিন্দের মতন স্বাধীনতা সংগ্রামী নয় আর সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর মতন সাহসী মানুষও নয় তাই একটু দেখেশুনে পা ফেলে ।

তো যাইহোক্ কিছু ভুলত্রুটি হয়ে গেলে মার্জনা করে দিও ওকে-- তোমরা ।

শিরিন ; ইরান থেকে এলো পাক্কা ৬মাস পন্ডিতে থাকার জন্য। অবশ্যি পরে দুমাস থিরুভান্নামালাইতে থেকে যায় ।এই দুই জায়গায় ও যে ছিলো সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বই । আর বাঙালি নয় বলে ভাষার কারিকুরি জানেনা অত । সহজ সরল ভাষায় লিখে ফেললো এই বই ।

কেমন লাগলো , কত মানুষ দেখলো , ঋষিদের দর্শন এইসব লিখলো ।

সবাই জানবে । মন ভালো হবে । দেহে আনন্দ লহরী খেলবে ।

একজন যোগী, ঋষি । সুন্দরভাবে পার্থিব জীবন কাটানোর কথা , বিবর্তনের কথা বলেন । অন্যজন

মহর্ষি । জীবন থেকে বেরিয়ে যাবার হদিস্ দেন ।

কিন্তু সত্যিই কি বার হওয়া যায় ?

নাকি মহাবতার বাবাজীর মতন ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যেতে হয় ;কোনো অদেখা দৈবলোক থেকে ?

সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই অভিসার ।

ঐশ্বরিক অভিসার । ইরানী কন্যা , আরবী ঘোড়ার সওয়ারি- পারস্যের গোলাপ মন্ডিত , দামি আতরে চোবানো ফরাসের ওপরে বসে এক মেয়ে শিরিন ।

ইরানী , রূপবতী শিরিন অনেকদিন ভারতে ছিলো যদিও সে তখন খুবই কমবয়সী ।এমনিতে পেশায় সে কবিরাজ । ইরানের ভেষজ ভান্ডার ও পুরাতন ঔষধ চিকিৎসা এইসব নিয়ে লেখাপড়া করে সে নিজের একটি বিউটি ক্লিনিক চালায় ডুবাইতে ।

সেখান থেকে আসে ভারতে । তার স্বামীও ডুবাইতে কাজ করে , জাতিতে সেও একজন পারস্যের মানুষ ও পেশায় কন্সট্রাকশান ইঞ্জিনীয়ার । ভদ্রলোক মুক্ত চিন্তার অধিকারী , পত্নীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন । একা ঘুরতে দিয়েছেন । ওদের একমাত্র পুত্র মামাবাড়িতে আছে । পড়ছে । সেও মধ্যপ্রাচ্যেই ।

শিরিন ঋষি অরবিন্দের আশ্রম নিয়ে লিখেছে কারণ ওর ভালো লেগেছে । তবে ও যেহেতু একজন মুসলিম ধর্মের মানুষ তাই হিন্দুদের সম্পর্কে গভীরে তেমন জানেনা তাই লেখায় হয়ত অন্য একটা দৃষ্টিকোণ উঠে আসতে পারে । আগেই সেই ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ।

ও অনেক বছর আগেও ওখানে যায় । সেই সম্পর্কেও লিখছে ।

পন্ডিচেরিতে গিয়ে ও সমুদ্র দেখলেও সেখানে নামতে সক্ষম হয়না কারণ পাড়টা পাথর দিয়ে বাঁধানো । বড় বড় পাথরের চাঁই । দুরন্ত ঢেউগুলি এসে লাফিয়ে পড়ছে সেই প্রস্তর খন্ডের ওপরে । সফেদ জলরাশি ভেঙে , গুঁড়িয়ে আবার বয়ে চলেছে সাগরের বুকে । এই ভাঙাগড়া নিয়েই জীবন ।

এক একসময় মনে হয় আর পারিনা কিন্তু আবার সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই জীবন নামক এই সাগরের বুকে ! আসলে জীবনটা যে কী কেউ কি তা জানে ? অথচ সবাইকে এরই মাঝে বাস করতে হয় । যেমন ঢেউ জানেনা তার অস্তিত্বের কারণ ও উৎসের কথা অথচ ভেঙে যাবার পরই ছুটে চলে যায় সেই উৎসের দিকে, আবার গড়া হয়ে গেলে ভাঙার জন্যে সেরকমই আমাদেরও একই অবস্থা । এইসব ভাবতে ভাবতে শিরিন ফিরে যায় ওর আবাসস্থলের দিকে যা কিনা এই সাগরের পাড়েই ছিলো । সেবার ও প্রথম পন্ডিচেরি এসেছিলো । যেই হোটেলে ঠাঁই নেয় তাতে নাকি অনেক অনেকদিন আগে স্বয়ং ঋষি অরবিন্দ এসে ছিলেন বহুকাল যাবৎ , অনেকদিন । পরে অবশ্যি ও অন্যদিকে গিয়ে সমুদ্রে নেমেছিলো । খুব সুন্দর সেই সাগরের পাড়, সবুজ জলরাশি । তবে মৎস্যজীবিদের জন্য বড্ড আঁশটে গন্ধ ছিলো সেখানে । মনটা ভেঙে যায় ঐ গন্ধে । অনেক অনেক আঁশ ছড়িয়ে ছিলো পাড়ে ।

শিরিন যেই ঘরে থেকেছে, সেখানে ওনার বড় ছবি আছে । ঘরটি খুবই সুন্দর । পুরনো পুরনো একটা গন্ধ আছে । আছে বহু প্রাচীন ফরাসী স্থাপত্যের চিহ্ন , কুলুঙ্গীর মতন একটি প্রদীপ রাখার জায়গা , ঢাঁউস একটি বই রাখার আলমারি যাতে ঋষি অরবিন্দের লেখা বহু পুঁথি ও ওনার ফটোর অ্যালবাম আর একটি ছোট মূর্তি ।

বেশ ভালো লাগলো ওর । মনে হল তার বাবাকে স্পর্শ করলো সে । শ্রী অরবিন্দর--বৃদ্ধ বয়সের ছবিটি দেখলে তার মনটা ভরে ওঠে । **বাবা তাকে মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন , মা তুই পন্ডিচেরি গেলি তাহলে ? আমাকে বাবা বলে ডাকলি ?**

এরকম যখন বলেন ওর খুবই ভালোলাগে । মনে হয় হৃদয়টা জুড়িয়ে গেলো । তার নিজের বাবা তাকে এত আদর করে ডাকলেও এমন ভালোলাগে না যদিও সে তাদের বাড়ির কোকিল বা রাজহংসী !সবচেয়ে আদরের । সাতরাজার ধন ; এক মানিক । তবুও । একেই বুঝি বলে স্পিরিচুয়াল যোগ । আত্মার যোগ । রক্তের সম্পর্ক তো নেই কোনো কিন্তু ওনার চেয়ে আপনজন যেন এই জগতে আর কেউ নেই ওর, আজকে । কারণ উনি হলেন শিরিনের গুরু । পথপ্রদর্শক । আর সদ্‌গুরুর চেয়ে

আপনার আর কেউই বুঝি থাকেনা আমাদের । তাঁর সাথে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক । আমরা তাঁকে ভুলে গেলেও ; তিনি আমাদের ভোলেন না ।

শ্রী অরবিন্দ

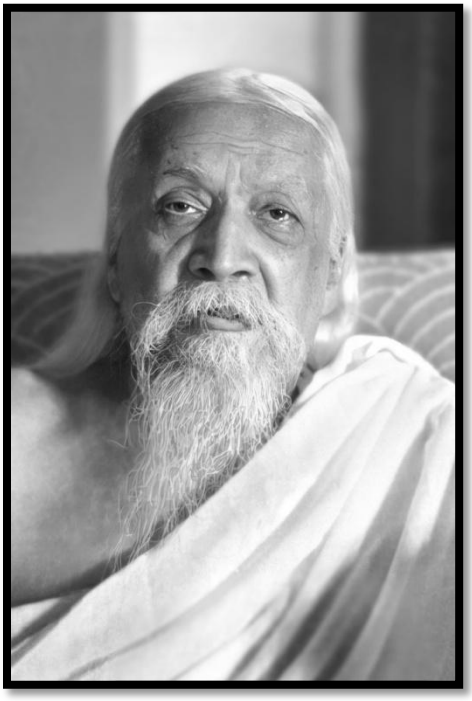

সরাইখানায় খাবার অবশ্যি সাধারণ । বেজায় মোটা চালের ফ্রায়েড রাইস ও চিকেনের টুকরো তাতে । আর আইসক্রিম, সেটা স্কুপে করে নিচ্ছে লোকে মনে হল ঘরে তৈরি । তবে সুস্বাদু ।

ও তো একাই ছিলো, তাই একটাই আইসক্রিম খেলো । আর সেটা হল স্ট্রবেরী ফ্লেভার । খুবই ভালো স্বাদের । ঘরোয়া গন্ধ তাতে ।

চাল ভাজা অর্থাৎ ফ্রায়েড রাইস, মোটা চালের হলেও তাতে মোরগের টুকরোগুলি হাড়বিহীন ছিলো ও বড় বড় ছিলো আর ছিলো অজস্র ক্যাপসিকাম , ফুলকপি , গাজর , মটরশুঁটি তাই ওর মন্দ লাগেনি । রাতে যখন রাতপোষাক পরে

নিলো তখন ওদের ছোট্ট ঘরে, অরোভিলেতে সৃষ্ট ধূপের সুগন্ধে-- নিমেষেই দু চোখ জুড়িয়ে এলো ।

সব ক্লান্তি কেটে গিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালো ।

স্বপ্নে ঋষি অরবিন্দকে দেখলো । একটি ঘন অরণ্যে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে । সেখানে একজন ধ্যানমগ্ন ঋষি যেন ওকে হাত নেড়ে কাছে ডাকছেন । ডেকে বলছেন , **মা তুই এতদূর দেশ থেকে এখানে এসেছিস ! কেমন লাগলো ফিরে গিয়ে কখনও লিখিস্ । তাড়াহুড়ো কিছু নেই । মনের কথা খুলে লিখিস্ ।**

যেন তাই আজ লিখতে বসেছে । কিন্তু স্বপ্ন তো অনেকদিন আগে দেখেছে তাহলে ?

আসলে পন্ডিচেরিকে এতদিন সে আত্তিকরণ করছিলো । অনুভব করছিলো । কাজের মধ্যে ।

নিত্যদিনের গানের মধ্যে । আত্মা দিয়ে স্পর্শ করছিলো ; কাঠগোলাপ ফুলের মতন ।

আজ মধ্যদিনে পৌঁছে, যেন বেলাশেষে এই গান রচনা করতে বসেছে শিরিন ।

মধ্যদিনের গান ।

আসলে শ্রী অরবিন্দের আশ্রম কেবল কোনো তীর্থ ক্ষেত্র বা আধুনিক যুগের সাধুদের মতন অর্থ কামানোর কারখানা নয় ।

এই পুণ্যভূমি হল এক কর্মভূমি বা কর্মযজ্ঞ ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন কর্মযোগী তাই তাঁকে জানতে হলে অনেক অনেক কিছু অনুভব করতে হয় কেবল কিছু পুস্তক পড়ে তাকে জানা সম্ভব নয় ।

শিরিন সময় নিয়ে চেষ্টা করেছে মাত্র । একজন মহাযোগীকে ত্রিমাত্রিকে ধরতে । কতটা সফল হল তা বলবেন পাঠকেরা ।

শিরিন আগেই বলেছে যে সে হিন্দু নয় ।কাজেই কিছু জিনিস সে হিন্দু ভক্তদের কাছে শুনে লিপিবদ্ধ করছে । যেমন হিন্দু পুরাণের কথাগুলি ।

ঋষি অরবিন্দের সমাধিতে গিয়ে বসলে একটি শক্তি এসে স্পর্শ করে ভক্তদের এবং সেটাই নাকি দীক্ষা পাওয়া । এখানে কোনো গুরুবাদের ব্যাপার নেই , কেবল পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সমাধিস্থল মোড়া যা বোঝায় যে মহাযোগী এখনও জীবিত ।

খুবই দৃষ্টিনন্দন সেইস্থান । সেখানে প্রবেশ করলেই মন শান্ত হয়ে যায় । অনেক ভক্ত সেখানে শ্রী অরবিন্দ ও মাদারকে তাঁদের সুক্ষ্ম দেহে দেখেছেন বলে শিরিন শুনেছে ।

যেমন এক প্রখ্যাত ভক্ত হলেন মাদার মীরা ও তাঁর স্বামী হার্বার্ট । ওনারা এই আশ্রমেই দীক্ষা পান ।

এখন ওনারা দুজনেই জার্মানিতে আছেন ও মাদার মীরা সেখানে ভক্তদের দীক্ষা দিয়ে থাকেন ।

মাদারের প্রতিষ্ঠিত ভক্তদের মধ্যে একজন সবার পরিচিত । উনি হলেন আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ম্যাডোনা । উনি মাদারকে নিয়ে গানও বেঁধেছেন ।

নিন্দুকে অনেক কিছু বলে । কিন্তু কেউ কি প্রশ্ন করে যে একটি ভারতের গ্রামের মেয়ে , যাঁর দুটি উজ্জ্বল আঁখি ছিলো , সেই সুনয়নী কি করে ম্যাডোনাকে ভক্ত হিসেবে পেলেন ?

তিনি কি জাদুটোনা করেছেন ?

আর ম্যাডোনাও কি এতই মূর্খ ?

শিরিনের কাছে আসল সত্য শোনো তোমরা ।

আরে মান্না দের গান মনে নেই ?

নিন্দুকে যা বলছে বলুক ! তাতে তোমার কি ? আর আমার কি ? রাগে যারা জ্বলছে জ্বলুক , তাতে তোমার কি ?

এও সেরকম ।

মাদার মীরা তো আর যে সে নন ! না হার্বার্ট !

যতই লুকিয়ে থাকুন , আর তো লুকাইতে পারলি না রে টিক্কা , আমি তো তোর ভক্ত রে দেইকখাই তোরে চিন্না ফেলাইসি (ভানু বন্দোপাধ্যায় কমেডিয়ান এর কমেডি অনুসারে লেখা) ---ভক্ত ম্যাডোনা --

মাদার মীরা হলেন স্বাহা দেবী আর হার্বার্ট হলেন স্বয়ং অগ্নিদেব ।

এনারা দুজনেই ঈশ্বর ও ঈশ্বরী । কাজেই ভক্ত তো হবেই । কিন্তু এক জন্মে তো মোক্ষ কারো হয়না তাই গুরুও এগোবে আর শিষ্যও এগোবে আর এইভাবে ক্রমাগত এগোতে এগোতে একসময় পরম ব্রহ্মতে মিলিয়ে যাবেন ।

ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে দীক্ষা দেবার কেউ নেই । অটোমেটিক দীক্ষা হয় । সমাধিতে বসে । তার কারণ হল ওনার দর্শন হল আমাদের গুরু আমাদের

অন্তরেই আছেন । তাই শিখিয়েছিলেন ওনার গুরু ওনাকে । সেই অন্তরের গুরুকে জাগ্রত করতে হবে । জাগ্রত করে তাকে ধীরে ধীরে মেলে ধরতে হবে আর সেই মেলে ধরার পদক্ষেপগুলিই হল ধ্যান , নানান মুদ্রা , তন্ত্র সাধনা , নানান আচার , আদি শঙ্করের নেতি নেতি কিংবা সোহম সাধনা ইত্যাদি ।

যেমন ধর না আর্শিতে ময়লা ধরেছে । কালো হয়ে গেছে সেই মিরর্ ।

তুমি বসলে আয়না ধুয়ে মুছে ফিটফাট্ করতে ।

এক এক বার ধুচ্ছো । একবারে সব ময়লা উঠবে না । ভীষণ নোংরা হয়েছে কাঁচ । তখন কেউ স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করছে, কেউ সাবান ব্যবহার করছে, কেউবা খালি জল দিয়ে ধুচ্ছে । এগুলিই হল ধ্যান ট্যান ইত্যাদি । লক্ষ্য হল ঐ কাঁচকে বার করা ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ । The Mother অর্থাৎ মীরা আলফাসা ;ওনার সহচরী ; বলে গেছেন ।

এবার বলো যে কৃষ্ণ মানে কে ? ভগবান বিষ্ণু ।

আর ভগবান বিষ্ণু কে ? জগতের পালক ।

তাই শ্রী অরবিন্দ, আমাদের-- দুনিয়াকে একটি সুন্দর এবং ব্যালেন্সড্ গ্রহ হিসেবে তৈরি করার ও ধরে রাখার জন্য ধ্যান করার উপায়ও নানান জীবন দর্শন দেখিয়ে দিয়ে গেছেন । তাই শিরিনের মনে হয় যে কেবল ধার্মিক মানুষেরাই নয় নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরাও এখানে আসতে পারেন ও দেখে যেতে পারেন যে জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই । এমনকি যুক্তিবাদী ও সাম্যবাদীরাও সুস্বাগতম্ । অরোভিলে ঘুরে গেলেই বোঝা যায় যে ঈশ্বরের দ্বারাই বোধহয় প্রচারিত হয়েছিলো কমিউনিজম্ । নাহলে ঋষি অরবিন্দের মতন একজন আস্তিক ও যোগী কি করে কল্পনা করলেন অরোভিলের এবং তা শুধু পরীক্ষিতই নয় সরকার দ্বারা পরিচালিত ও আন্তর্জাতিকভাবেও প্রমাণিত ।

শয়ে শয়ে মানুষ এখানে এসেছে । থাকছে ।

কোনো মোহরের চল নেই । নেই ডলার বা পাউণ্ড । চলে অরো কার্ড । মুচি যেই মাইনে আয় করে চিকিৎসকও তাই আর তাতেই সবাই খুশি । **সবাই রাজা, অরোভিলের অরবিন্দ রাজার রাজত্বে ।**

এখানে কেউ কাউকে খুন করেনা । ধর্ষণ করেনা । শিশু শ্রমিকের মারধোরের ঘটনা নেই । নেই অর্গ্যান পাচারের কাহিনী । সবুজে মোড়া এক নগরপাড়ে রূপনগর । তামিল নাড়ু ও পন্ডিচেরি এই দুই এলাকার মাঝে ।

সবাই হেসে কথা বলেছে । কেউ কাউকে বুলিং করছে না ।

----এই, তুই কি কেলে , মুটকি , নাটা , কুচ্ছিত ইত্যাদি ।

অহেতুক চাপ দিচ্ছে না কেউ । দুনিয়ার সব দেশ থেকেই অজস্র মানুষ এসে বসবাস করছে ।

যে যার নিজের কাজ করে চলেছে । কেউ কেউ ধ্যানমগ্ন । কেউ নতুন নতুন ব্যবসা করছে প্রগতির জন্য । মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । পর্ণগ্রাফি কিংবা আজেবাজে গ্যাম্বেল করা নয় ।

ধর্মের নামে লোক ঠকানো নয় । ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নয় । **মোদ্দাকথা হল ; আমাদের কাছে যা আশা করেন ঈশ্বর- এই জগতে আমাদের পাঠানো হয় যার জন্য, সেইসব কিছুই অরোভিলেতে পালন করার পরিকল্পনা করা হয় ।**

এছাড়াও যারা চিন্তাশীল ও মানবজীবনকে কিছু দিয়ে যেতে চান ; তারা নানানভাবে তাদের অবদান এখানে কাজে লাগাতে পারেন- বিভিন্ন প্রোজেক্ট-এ কাজ করে । তা নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত হতেও পারে আবার অন্যের চিন্তার ফসলও হতে পারে ।

মুণিঋষিগণ বলেন যে আমরা আমাদের চিন্তার ফসল । কাজেই আমরাই পারি নিজেদের শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে । এটাই ছিলো অরোভিলের মূলমন্ত্র । শিরিন যতটা বুঝেছে ।
আর আগেই বলেছে ও বোদ্ধা নয় । মতভেদ থাকতেই পারে ।

অরোভিলে, নামটা কেউ বলেন **অরোরে** কোনো ফ্রেঞ্চ শব্দ তা থেকে এসেছে যার অর্থ ভোর আর ভিলে মানে ভিলেজ বা গ্রাম আবার কেউ বলে ঋষি অরবিন্দের নাম থেকে **অরো** এসেছে ।
সবুজে মোড়া , লাল মাটির এই গ্রামে ঢুকলে চন্দ্রবিন্দুর সেই গান মনে পড়ে যায় হয়ত ।
শিরিন এই গান শুনেছে ওর এক বাঙালী বন্ধুর কাছে , খুবই মিষ্টি সুর । ওর মন ধ্যানের গভীরতায় চলে যায় এই গান শুনলে ।

নীল নির্বাসন ; সেই গানের নাম ।(Nil Nirbason by Chandrabindu)

চেনা মুখ , ছুঁয়ে থাকা দৃষ্টি
এলোমেলো আড্ডায়, চায়ের গেলাস
ঘুম ঘুম ক্লাসরুম
পাশে খোলা জানালা
ডাকছে আমাকে তোমার আকাশ --

আসলে অরোভিলের আকাশ ।

এখানে মানুষের কোনো জাত নেই , ধর্ম নেই , রাজনৈতিক বন্ধন নেই , চমড়ার রং নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই , আর্থিক সামর্থ্য কিংবা নারী/ পুরুষ ও কিন্নরের মতন ধারণা নিয়ে নেই কোনো বাধা নিষেধ । এখানে সবাই মানুষ এবং মানুষ এবং মানুষ । এখানে সবাইকে ডাকছে অরোভিলের আকাশ ! **নীল নির্বাসন থেকে নির্বাণ! বাদ গেলো স । অরোভিলেতে আসা এই স-কে সরাবার জন্য ।**

এখানে কারো আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নেই । নেই সেই স্বপ্ন স্পর্শ করতে না পারার অবর্ণনীয় কষ্ট ও তাতে অবসাদে ডুবে আত্মঘাতী হওয়া কিংবা মানসিক হাসপাতালে জীবন কাটানো । নেই মাদকদ্রব্যে ডুবে যাওয়া । মহিলাদের ধরে কিংবা শিশুদের ধরে নিয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শোষণ ও ধর্ষণ করা অর্থাৎ অত্যাধুনিক সমাজের কোনোরকম কালিমা এই জগৎকে স্পর্শ করেনি । আছে কেবল মুক্তজীবন ও শান্তি পারাবারের হদিস্ । সারা দুনিয়া থেকে নানান জাতের ও ধর্মের মানব সন্তান এখানে এসে সঙ্ঘ তৈরি করেছে । এই সঙ্ঘ হল শান্তির সঙ্ঘ । যে যার কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত ।

যেহেতু এই গ্রাম ভ্রমণের স্থান নয় তাই স্থায়ী বাসিন্দাদের কুটিরের দিকে যাওয়ার নিয়ম নেই তবে অনেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে কিছুদূর অবধি চলেও যায় । অসম্ভব সবুজ সেইসব পথ । **তাল গাছ থেকে ঝরে পড়েছে সুগন্ধী তাল অথবা বাঁশের ঝাড় থেকে উঁকি মারছে নাম না জানা কোনো নির্মল পক্ষী শাবক যার নির্মম সভ্যতা নামক অসভ্যতার হাতে মরে যাবার ভয় নেই । আজকাল বনের বুনোরাই বেশি সভ্য আমাদের চেয়ে তাইনা ।**

চারদিকে কেবল সবুজের ভেলভেট আর লাল মাটি ও শান্তির সমুদ্র । খুবই দৃষ্টিনন্দন ও মন ভালো করা পরিবেশ । যেখানে মানুষের জীবন ধারণের কোনো টেনশান নেই সেখানে আগ্রহীরা ঐশ্বরিক সাধানায় নিয়োজিত হতেই পারেন যা এখানকার মানুষজন ও সম্ভবত: পশুপক্ষীরাও করে চলেছে ।

এরকমই এক জগতের সৃষ্টি বুঝি ব্রহ্মা করেছিলেন যা আমরা ক্রমে ক্রমে দূষিত করে ফেলেছি ।

দৈত্যি দানবের করাল গ্রাসের কারণে । মান ও হুঁশ গেছে কোন অতলে , পড়ে আছে কেবল চাপ চাপ রক্ত ও মাংস । ঋষি অরবিন্দ, আবার সেই রক্ত ও মাংসে মানুষ ভরে দিচ্ছেন যেন !

আর শুধু মানুষ কেন ? সবাই এগোবে । আমাদের বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে হবে তাই না ? তাই তো এই গ্রাম !সাধনা করে করে নিজের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই উচ্চতায় যেখানে ঈশ্বর ও আমরা একই ছন্দে কাজ করবো । **তবেই তো জগতের পালক, ভগবান --শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণু খুশী হবেন ।**

হিরণ্যকশিপু ও কংসের আনাগোনা কমে যাবে । আজকাল ঘরে ঘরে তো এদেরই জন্ম হচ্ছে ।

নাহলেও ; ধীরে ধীরে মানুষ এদের দলেই যোগ দিচ্ছে ! তাই মনে হয়, বর্তমান দুনিয়ার মানুষ অন্তত: একবার এই অরোভিলে ঘুরে যাক্ । মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য । এখানে এতটাই শান্ত পরিবেশ যে একটি পোকা ও প্রজাপতির আলাপচারিতাও বুঝি কানে আসে । এখানে নৈ:শব্দ্যও কথা বলে । আর রাতে , জোছনা গলি দিয়ে চলে যায়না , প্রতিটা ঘরে গিয়ে নীরবতা ভেঙে কথাকলি নৃত্য করে ।

অরোভিলের বনে, রাতের আঁধারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনে মনে হয় অরণ্যে ঘুঙুর বাজছে ।

--- ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম , টিং টিং, টুং টুং টাং টাং । কখনো বা মাদলের শব্দ । গাছে গাছে মিতালী হয়েছে বেশ, তাই ডালপালার আওয়াজ !

আসলে এগুলি হল পবিত্র ধ্বনি । শুনলেও আত্মা শুদ্ধ হয় । মনের কালিমা ধুয়ে যায় ।

ওঙ্কার ধ্বনির মতন ।

আমরা তো সবাই আদতে কম্পন ও নাদ । বিজ্ঞানও তাই বলে । আমাদের স্থুল দেহও হল সেই কম্পন ও নাদের স্ফটিকাকার/কেলাসিত

রূপ (ক্রিস্টালাইজড্ আকার) । সুতরাং যেখানে বড় বড় মুণি ঋষিগণ তপস্যা করে যান, সেখানকার কম্পন ও নাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে যা সাধারণ মানুষ ও যোগীদের বা সাধকদের দেহের ও মনের গঠণকে পরিবর্তন করে শুদ্ধ করে থাকে । যেমন আগুনে হাতে দিলে হাতে পোড়েই । সে নাস্তিকই হোন আর আস্তিক । একই ঘটনা এখানেও হয় । আমরা বুঝি কিংবা না বুঝি ।

ঋষি অরবিন্দ ওরফে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সহচরী দা মাদারের সাধন ক্ষেত্র এই অরোভিল । ওনাদের

সৃষ্ট ; একান্নবর্তী এই পরিবার ও ছন্দশ্রী শোভনতার নামই অরোভিলে ।

অরোভিলের মাঝে আছে মাতৃমন্দির ।

সবসময় দেখা সম্ভব নয় । তবে শিরিন গিয়েছিলো এর অন্দরে । তখন মাতৃমন্দির তৈরি হচ্ছে । অনেক আগে । এই অঞ্চলকে শান্তির একটি নীড় বলা হয় । মন্দিরের আকার গোল একটি বলের মতন । স্টিলের তৈরি এই বিশালাকৃতি বলের গায়ে সোনার প্রলেপ দেওয়া ও ৪টি স্তম্ভের ওপরে দাঁড় করানো । আছে ৪টি-আধ্যাত্মিক থিম্ । দা মাদারের ; আমাদের এই জগতের সঙ্গে যা সম্বন্ধ

অর্থাৎ চারখানি শক্তির মাধ্যমে যে উনি যুক্ত আমাদের সবার সাথে সেই সম্পর্কে ঐ স্তম্ভগুলির সূচণা করা হয় এসব কথিত আছে । অন্দরে আছে আরো একটি সুবিশাল কাঁচের/স্ফটিকের বল । আর এই মন্দির তৈরি হতে ৩৭ বছর লাগে । এই মাতৃমন্দিরের ভেতরে একটি ধ্যান গর্ভ আছে যাকে ইনার চেম্বার বলা হয় । এখানে আগে থেকে অনুমতি নিয়ে যেতে হয় কারণ এটা কোনো ভ্রমণের স্থান নয় । তপস্যার জায়গা ।

দা মাদারের চারটি স্তম্ভের গুরুত্ব বোঝাতে ওনার চারটি বিশেষ রূপের কথা শ্রী অরবিন্দ আমাদের বলে গেছেন । তা হল, দা মাদার কখনও হলেন ,

মহেশ্বরী কখনো মহাকালী , কখনোবা মা মহালক্ষ্মী আবার কখনো সন্তানের জন্য মা হয়ে ওঠেন মহা স্বরসতী !

অর্থাৎ , দা মাদার হলেন জ্ঞান , শক্তি , শান্তির প্রতিমূর্তি আবার উনি যোদ্ধা ও জগতের রক্ষা করছেন অসৎ শক্তির হাত থেকে আবার কখনো উনি রূপের আধার , মিষ্টত্বের ধ্যান লহরী বয়ে চলেছে মায়ের জটা থেকেই , উনি এক অপরূপা দেবী , এক রহস্যময়ী আদ্যাশক্তি যার কোনো শুরু নেই শেষ ও নেই , উনি অমর ও অলীক । আবার

দা মাদারই হলেন মহা স্বরসতী , সমস্ত বিদ্যার অধিকারিনী । আমাদের আলোর পথে চালনা করেন মা । আবার সন্তান জ্ঞানের পথে পা বাড়ানোর সাথে সাথে মায়ের কোমল আঁখি তাকে ঘিরে রাখে পরম মমতায় ; ঠিক তার আপন মায়ের মতন , এক নির্ভেজাল পবিত্র আঁচলে বেঁধে রাখে । এই সত্য নিয়েই এই চারটি স্থম্ভ চারদিকে ।

দক্ষিণী - মহেশ্বরী , উত্তরা - মহাকালী । পূর্বা - মহালক্ষ্মী , পশ্চিমা - মহাস্বরসতী ।

শ্রী অরবিন্দ কিন্তু আশ্রমের গঠন ইত্যাদির দায়িত্ব মাদারকে দিয়ে অবসর নেন । মাদার পরে নিপুন হস্তে সব গড়ে তোলেন । ওনাকে ঋষি, নিজের স্তরের সাধিকা বলেন ।

ওনারা ছিলেন টুইন ফ্লেম । অর্থাৎ একই আত্মা দুই দেহে । যেমন রাধা কৃষ্ণ , ইন্দ্র শচীদেবী , কৃষ্ণ অর্জুন (নর নারায়ণ) ব্রহ্মা সরস্বতী , যীশু মেরি ম্যাগডালিন, হর পার্বতী ইত্যাদি ।

যদিচ মাদার, ওনাকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন ।

একই আত্মা, দুই দেহে থাকা সম্ভব । বিজ্ঞানও এটা দেখেছে । একে ফিজিক্সের ভাষায় বলে কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট ।

এই **টুইনফ্লেম** সম্পর্কগুলি সবসময় খুবই ইনটেন্স হয় ও সর্বদা রোমান্টিক হয়না।

এগুলি মূলত অধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও কারণে হয়।

সাধারণ মানুষ এর টুইন ফ্লেম হয়না। এগুলি খুবই রেয়ার কেস্ যদিও আজকাল পশ্চিমে এই নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে।

যারা খুবই স্পিরিচুয়াল ও ইভলবড্ সোল তাদেরই একমাত্র সত্যিকারের টুইন সোল থাকে। এরা পৃথিবীতে জন্ম নেয় মানুষের ভালো করার জন্য। আর একটি আত্মাকে বিভাজিত করা হয় তখনই যখন একজন অধ্যাত্মিকভাবে অগ্রসর হয়ে অন্যজনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, মোক্ষের পথে। অনেকে বলে আত্মাকে কাটা যায়না, ছেঁড়া যায়না গীতায় লেখা আছে। তাহলে দুই দেহে একই আত্মা কীদৃশ ?

বিভাজন করার অর্থ তো আমাদের পার্থিব কাটাছেঁড়া নয়। ছুরি বা তরোয়াল দরকার হবে। এগুলি অন্যরকম ভাবে হয়। তবুও যদি এখানকার কথায় বলি তাহলে কাটা হয়ত যায়না কিন্তু রেপ্লিকা বা নকল বানানো যায়। অর্থ হল আমাদের বামদিকে দৈহিক হার্ট থাকে যা দেহে রক্ত সঞ্চালন

করে থাকে আর স্পিরিচুয়াল হার্ট থাকে ডান দিকে । আর টুইন ফ্লেমের ক্ষেত্রে তাদের ডানদিকের হার্ট একই থাকে কেবল মনটা বিভাজিত হয়ে যায় , বা অহং -টা ভাগ হয়ে যায় । কিন্তু স্পিরিচুয়াল হার্ট একটাই থাকে তাই তারা একই মানুষ বা দেবতা বা বিং (Being) !!

ফ্রি- উইল বলে আদতে কিছু হয়না । মহাবিশ্ব সর্বদাই ব্যস্ত থাকে, প্রতিটি জীবকে ঠেলে পরাব্রহ্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে । ফ্রি -উইল এর অর্থ আমরা মনে করি এই জীবনে যা করি তাই কিন্তু আমাদের দেহ রাখার পরে ঠিক সেইরকম জন্মই হয় যা আমাদের বিবর্তনের পথে সাহায্য করবে । যদি কেউ স্পিরিচুয়াল সাধনা করে থাকে তার এগিয়ে যেতে সুবিধে হবে আর যদি কেউ না করে তাকে মহাবিশ্বে ঠেলে দেবে এমনভাবে যাতে সে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যেতে পারে ।

এই কথার অর্থ হল ; যে যেমন পর্যায় থাকে তার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা ঘটে । অবশ্যই একজন ক্রিমিন্যাল আর একজন ভালোমানুষের ক্ষেত্রে একই রকম জিনিস হবেনা ।**ওয়ান সাইজ ফিটস্ অল বলে কোনো কথা নেই স্পিরিচুয়ালিটিতে** । যে যেমন কর্ম করবে তার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা ঘটবে

। **কিন্তু মহাজাগতিক জীবনে এমন জিনিস হবে যা চেতনাটিকে বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।**

জিনিসগুলো জটিল । এইভাবে বোঝা হয়ত সম্ভব নয় । কাজেই এইগুলো নিয়ে এখানে এত আলোচনা না করাই শ্রেয় । এই কারণেই ঋষি অরবিন্দ, **সুপ্রামেন্টাল যোগার** কথা বলেছেন যাতে সবাই এগিয়ে যেতে পারে বিবর্তনের পথে ।

অরোভিলে দেখে শিরিনের খুবই ভালোলেগেছে।

ও স্থির করেছে অবসর নিয়ে এখানে এসে থাকবে । ও সাইকেল চালাতে জানে কাজেই ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হবে । এখানে অনেক খাবার দোকান ও হস্ত শিল্পের দোকান আছে । সবই এদের সংস্থা ও সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে । যে কেউ নিজের কোনো সংস্থা শুরু করতে সক্ষম ।

এখানে স্বাস্থ্যকর খাবার মেলে কাফেগুলোতে ।

দক্ষিণী দেশের খানা ছাড়াও বিদেশী খানাও মেলে । শিরিনের ভালো লাগালো জবাফুলের সরবৎ ও লেমন গ্রাসের সরবৎ ।

মাতৃমন্দিরে শুনেছে ১০০র বেশি দেশ থেকে নাকি মাটি এনে রাখা হয়েছে । তাই বুঝি কতনা দেশ থেকে লোকজন এসে এখানে বাসা বাঁধছে । আর কেউ কারো সঙ্গে রেষারেষি করছে না । মিতালি করেছে সকলে । এমন কাউকে দেখলো না যে বুলিং করছে বা অকারণে বিবাদ করছে টিপিক্যাল ভারতীয় রাজনৈতিক দলীয় মানুষদের মতন ।

--আমাদের ফান্ডে চাঁদা দাও সব হয়ে যাবে ।

ভারতের সরকার ও বিদেশী অনুদানে চলে এই শহর আর ভক্তের দান ও নিজেদের শিল্প ও সংস্থা থেকেও আয় হয় । এদের বিদ্যুৎ, সূর্য থেকে উৎপাদন করা হয় । পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে সাজানো সব । নিঁখুত টাইমিং । ফ্রি -বাস আছে পন্ডিচেরি শহরে নিয়ে যাবার জন্য । **তবুও নিন্দুকের অভাব নেই । অনেকেই বলে এখানে ভারতীয়দের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়না । পুরো ফ্রেঞ্চ কলোনি একটা !!**

শিরিনও কিছু শুনেছে কিন্তু ওর মনে হয় এটা আন্তর্জাতিক একটি কার্যালয় তাই হয়ত ফরাসী মানুষের সংখ্যা বেশি, আর মনে রাখতে হবে ঋষি অরবিন্দ যখন এখানে আসেন তখন এটি ছিলো পুরো ফরাসীদের দখলে এবং আমাদের আদরের

মা- দা মাদার , মীরা-আলফাসাও ফরাসী দেশ থেকে এসেছিলেন আগে । কিন্তু মনকে বলেছে যে ওর কাজ ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাকে কাজেই লাগিয়ে বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া । নিন্দা, তর্ক , গালিগালাজ সবাই করতে পারে কিন্তু এই ছোট্ট জীবনে, বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে কজন পারে ? আর লোকে এও বলে আশেপাশের গ্রামে নাকি লোকাল গুন্ডারা করে থাকে খুন-জখম !

যেখানে মানুষ সেখানে এসব হবেই কারণ সবার মনের স্তর একরকম নয় আর সেসব ঠিক করতেই তো এখানে আসা !! **কলিযুগে বে-আইনি কাজ হবেই । আইনের কাজ করার জন্য পুলিশ আছে । সেই কাজ শিরিনের তো নয় ; তার কাজ অনুভূতি লিপিবদ্ধ করা ও ঋষির নির্দেশিত, শাশ্বত চেতনার পথে পাড়ি দেওয়া ।**

আগে এই লালপাহাড়ী, রাঙামাটির এলাকা ঘন বনে ঢাকা ছিলো কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারে ন্যাড়া হয়ে পড়ে । অরোভিলের বাসিন্দাগণই একে আবার সবুজ অরণ্যে পরিবর্তন করেন ও পরিবেশের উপকার করেন । অরণ্যায়ন , বনানীর লহরী তোলা । পুরো একটি শুষ্ক , অনুর্বর এলাকাকে সবুজ করে তোলাও সহজ নয় ।

বিশাল এই এলাকা, আবার নি:শ্বাস নিতে সক্ষম হয় তাদের এই কঠিন আত্মত্যাগ ও কর্ম নিষ্ঠার জন্য ।কিন্তু এই জগতে কোনো কিছুই নিঁখুত নয় । কেউ পার্ফেক্ট নয় সবাই জানে তাই অরোভিলের নিজস্ব সমস্যা আছে । তাই বলে চালনি যখন ছুঁচের ছিদ্র সন্ধান করতে শুরু করে-শিরিনের ভালোলাগে না ।

অরোভিলে, কোনো স্বপ্নরাজ্য নাকি পরীদের দেশ সেটা বড় কথা নয় যেটা সত্য ও সবসময়ই সত্য থাকবে তা হল এক বিদেশিনী একা হাতে এই বিশাল কর্মকান্ড তৈরি করে গেছেন এবং আজও তা আমাদের সেইদিকে আকর্ষিত করছে ।

আমরা শান্তির আশায় সেখানে ছুটে যাচ্ছি ।

বিরাট একটি অনুর্বর এলাকা ; সবুজ হয়েছে এই কারণে যা সবসময়ই কাম্য । সেখান থেকে কেবল মানুষই নয় , পশুপাখি ও গাছপালাও সমৃদ্ধ হচ্ছে ও কার্বন ট্যাক্সের ব্যাপারে সাহায্য করছে ।

আর তিননম্বর কারণ হল-- পিছিয়ে পড়া জাতি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আজও আন্তর্জাতিক ভাবে যা যা নিয়ে গর্বিত হতে পারে তার মধ্যে একটি হল এই অরোভিলে আর অন্যটি হল ইস্কন ।

সমালোচনা হবেই কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কর্মকান্ড । কারণ ঐ যে বলা হল কেউই পার্ফেক্ট নয় । আর তার জন্যই বিবর্তন । আর বিবর্তনের জন্যই জন্ম অরোভিলের !!

সোজা ভাষায় লিখলে , লেখা চলে যে পরিস্থিতি কিংবা সমস্যাকে সবচেয়ে দক্ষভাবে সামলে চলার নামই সভ্যতা ।

কাজেই মদের গেলাস নিয়ে পা নাচাতে নাচাতে আন্তর্জালে বসে টুইটার হ্যান্ডেলে কুৎসা রটানোর আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন , আমি কি কি করেছি মানব জাতির জন্য ! আর আমি কি আদৌ অরোভিলে গিয়েছি নাকি লোকের মুখে শুনে !

আচ্ছা , যেতে তো পারিই কিন্তু কেন যাবো !!

আমার ইগো কি আমায় যেতে দেবে ???

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিন্দু পুরাণে দুটি গল্পের কথা নাকি লেখা আছে । শিরিন শুনেছে । একটি নিয়ে শ্রী অরবিন্দ তো কাব্য রচনা করেছেন , **সাবিত্রী নামটি তার** ; আর অন্যটি হল **মনসামঙ্গল ও শিবপুরাণের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ।**

এই দুই সতী , বেহুলা ও সাবিত্রী ; যমরাজার হাত থেকে তাঁদের স্বামীদের ফিরিয়ে এনেছিলেন । অর্থাৎ তাঁদের পতিদের মৃত্যু হয় প্রকৃতির নিয়মে কিন্তু এই অসীম পতিব্রতা পত্নীগণ নিজেদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং তপস্যা দিয়ে স্বয়ং যমের মুখ থেকে নিজেদের স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন এবং আমাদের পার্থিব নিয়ম ভঙ্গ করে- মানব সন্তান , তাঁদের জীবনসঙ্গীরা জীবিত হয়ে ওঠেন ।

শিরিন জানেনা এগুলি কাহিনী না ইতিহাস তবে যাইহোক্ না কেন ঘটনার মূল দর্শন শিক্ষণীয় আর সেটা আজকের যুগে কেন প্রতিটা যুগেই লক্ষণীয় । বিশেষ করে আধুনিক নামক অত্যাধুনিক যুগে মানুষের জীবনে যেই অবক্ষয় শুরু হয়েছে , স্বার্থপরতা ও যৌনপিপাসা মেটাবার নামে একের

পর এক সঙ্গী নির্বাচন ও কখনো কখনো বা নিজেরই জীবনসাথীকে হত্যা করে ধনসম্পদ ও জীবন বিমার অর্থ দাবী করা ইত্যাদি সেই সময় এই ঘটনা মানুষকে একটা দিশা দেখায় । হয়ত অনেকেই অবিশ্বাসীর হাসি হেসে নস্যাৎ করে দেবে এগুলিকে অলৌকিক ও অপার্থিব বস্তু বলে । ব্যাঙ্গ করে বলবে যে এগুলি হল অবাস্তব জিনিস কিন্তু নিজেরই স্বামীকে খুন করে জীবনবিমা দাবী করা কিংবা একের পর এক সঙ্গিনী বদল করা কেবল যৌনজীবন কড়কড়ে রাখার জন্য সেটাও কি স্বাভাবিক কোনো বস্তু ? অথবা যৌনতায় নতুনত্ব আনতে শিশুকে শোষণ করা , এটা ? এই নিয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে ফেলা, শহরের তথাকথিত অভিজাত সমাজের মধ্যে ?

এইজন্য কি আমরা মানুষ হয়েছি ? নাকি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আত্মিক উত্তরণ ?

সামাজিক উন্নতি ? গোষ্ঠিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হওয়া বিবর্তনের পথে যা মহাজগৎ চায় ?

আগে দেহপসারিণীদের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখতো । আজকাল সিনেমার পর্দায় অভিনয়ের দোহাই দিয়ে **নীলছবির নায়িকার** মতন ঘোর আপত্তিজনক জিনিস দেখানো হচ্ছে অথচ সেইসব তথাকথিত

অভিনয় কর্মীদের (আমি অভিনেতা/নেত্রী বলছি না তাদের) কেউ বেশ্যা বললে তারা ক্ষেপে উঠছে । আইনের সাহায্য নিচ্ছে । অথচ যে সমাজের নিষ্ঠুরতার বলি হয়ে আজ বাজারে নিজের ইজ্জৎ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তার গায়ে পাপিষ্ঠা লেবেল অতি অনায়াসেই আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি কারণ তার হয়ে বলার কেউ নেই । আমাদের সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে । তাই শিরিনের মনে হয় এই ঘটনা- কাহিনি কিংবা ইতিহাস যাইহোক্ না কেন (পুরাণও একটা সময় ইতিহাসই ছিলো , সেটা সময়ের ওপরে নির্ভরশীল) আজও মানব সমাজের কাছে যথেষ্ট আবেদন রাখে ।

মানুষ এক সঙ্ঘবদ্ধ ও গোষ্ঠিবদ্ধ জাতি বা জীব , এরা একা থাকতে সক্ষম নয় । তাই সমগ মানবজাতির জন্য যা সুস্থভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তাই আমাদের নিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে ; এই ধরায় ।

নারীরা পুতুল নয় ।

নারীরা ভোগ্য বস্তু নয়, পণ্য নয় । নারীদের দেহ ও রূপ ব্যাতীতও সমাজকে আরো অনেক কিছু দেবার আছে । নারীর শক্তি ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়

এই গল্পগুলি । একজন রমণী হল ধাত্রী ও করুণার আধার । তার ওপরে বিশ্বাস করে ও তারই মমতায় সিক্ত হয়ে অজস্র মানুষ বেঁচে থাকে এই জগতে ; কাজেই সাবিত্রী ও বেহুলার হৃদয়ের বিশালত্ব, ধৈর্য্য ও ভক্তি এবং অসীম মমতার কথা জেনে যদি অল্প কিছু মেয়েও নিজেকে পরিবর্তন করে বা চায় তা করুক না !

দেখুক বিউটি কুইনগণ অথবা অন্যধরণের নানান ট্যাগ দেওয়া আধুনিক স্বার্থপর ও হিংস্র নারীর বাইরেও অনেক মেয়ে আছেন যারা আমাদের আদর্শ হতে পারেন । তার জন্য হাতা খুন্তি ধরতে হবে তাও না অর্থাৎ বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে তাও না মনে মনে সাবিত্রী ও বেহুলার মতন শক্তিময়ী তারা হতেই পারে । শিরিনের এখানে একটা কথা মনে হয় তবে কাউকে বলেনি কোনোদিন কারণ লোকে ওকে ক্রেজি মনে করতে পারে । সেটা হল একজন নারী সুন্দর হয় অন্তরের সৌন্দর্য্য দিয়ে যা এইসব বিউটি কন্টেস্টে দেখানো হয় অথচ এইসব প্রতিযোগিতাতেই আবার নারীকে অর্ধনগ্ন করে দেখানো হয় । অথচ ভারতের সেই রাণী পদ্মাবতী যাকে কেউ কোনোদিন দেখেনি , তিনি এতই রূপবতী ছিলেন যে আজও তাঁর রূপের চর্চা হয় । কাজেই কাউকে রূপের মাপকাঠিতে মাপতে হলে

সম্পূর্ণ অচেনা একগুচ্ছ এবং পরবর্ত্তীতে সারাদুনিয়ার মানুষের সামনে অর্ধনগ্ন হতে হবে কেন ? সুইম-স্যুট পরে ; দৈহিক মাপজোক দিতে হবে কেন ? এসব দেখার জন্য তো বাসায় স্বামী আছে ! উপপতিও থাকতে পারে ।

অনেকে বলতে পারেন যে আর্টিস্টরা তো নারীদেহের চিত্র আঁকেন । সৌন্দর্য্য নিয়ে কাজ করেন ভাস্কররা । তা করেন কিন্তু শিরিনের বক্তব্য হল তারা বিশেষ গোষ্ঠির মানুষ, **অ্যান্ড গড্ ক্রিয়েটেড ওম্যান** এই দর্শন নিয়ে চর্চা করেন । কিন্তু আমরা একটা গড়পরতা সমাজ করে বাস করি । সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকি । সেখানে সবরকম লোক আছে । সবাইকে বদলানো সম্ভব নয় । আর সমাজে একটি বন্ধন থাকে নাহলে যারা অসৎ মানুষ তারা মনে করে যে বাঁধন খুলে গেছে এবং অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় । **তাই পুরো দুনিয়াকে চামড়া দিয়ে ঢেকে ফেলার চেয়ে নিজে জুতো পরে নেওয়াই ভালো ।**

++++++++++++++++++++++++++

বেহুলা ও লখিন্দরের গল্পে মূল দেবী হলেন মনসা । উনি সর্পের দেবী । তাঁকে পুজো দিতে রাজি হননা লখিন্দরের পিতা ব্যবসাদার চাঁদ সওদাগর ।

তাই মনসা দেবী , লখিন্দরের প্রাণ হরণ করেন । অবশেষে তাঁর পিতা পুজো দিলে মনসা প্রাণ ভিক্ষা দেন কিন্তু এর মধ্যে বেহুলার ভক্তিও একটি বিরাট ভূমিকা নেয় । এখানে মনসাদেবী ; অনেকটা আধুনিক ফেমিনিস্টদের মতন, পুরুষ বণিক ও অহঙ্কারী সওদাগর চাঁদের কাছ থেকে পুজো আদায় করেই ছাড়েন ।

শোনা যায় লোকগাঁথায় যে মনসা দেবীকে চাঁদ বণিক , **চ্যাং-মুড়ি কানি** বলেও গালি দিয়েছিলেন কারণ মনসা দেবীর একটা নয়নে দৃষ্টি ছিলো না ।

পন্ডিতগণ, মনসাকে আদিবাসী দেবী বলেও বর্ণনা করে থাকেন । অনেকে ওনাকে শিবের কন্যা বলেও বর্ণনা দিয়ে থাকেন ।

পুরাণে তাঁর কথা বলা আছে আর সেখানে কাশ্যপ মুণি তাঁর পিতা অথচ মঙ্গলকাব্যতে বলা হয় তাঁর পিতা শিবঠাকুর । এগুলি নিয়ে দ্বিমত হলেও মনসা একজন দেবী বলেই স্বীকৃত হন ।

মনসা দেবী (আন্তর্জাল)

মুসলিম কন্যা শিরিন ওনাকে ফেমিনিস্ট দেবী বলে মনে করে ।

সাবিত্রী কাব্যগ্রন্থ ::

শ্রী অরবিন্দ, সাবিত্রী কাব্য গ্রন্থ একদিনে লেখেন নি । সারাটা জীবন ধরেই লিখেছিলেন বলে শোনা যায় ।

২৪০০০ লাইনের, ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা এই পুস্তক সাবিত্রী ও সত্যবানের পুরাণ কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে লেখা । এই কাব্যের মাধ্যমে উনি যেমন ধার্মিক ব্যাপার নিয়ে লিখে আমাদের বুঝিয়েছেন সেরকম সাবিত্রী ও তাঁর পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতির অধ্যাত্মিক বিবর্তনের সম্পর্কেও লেখেন । ১৯১৬ সনে এই বইয়ের প্রথম খসড়া লেখেন । ১৯৩০ সাল নাগাদ উনি এই পুস্তককে অনেক বড় একটি বইতে রূপান্তর করার কথা ভাবেন ও মহাকাব্য রূপে তার রূপ দান করতে শুরু করেন ।

তাঁর জীবনের শেষদিন অবধি শিরিনের বাবা অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ এই মহাকাব্য নিয়ে লেখালেখি করে গেছেন । তাকে নিঁখুত একটি অবয়ব দিতে ।

অরূপকে রূপে ধরতে ।প্রাণ দিতে, তার সন্তানের ।

ঋষি অরবিন্দের মৃত্যুর পরে প্রতিটি লেখাকে এক জায়গায় করে একটি খন্ডে প্রকাশ করা হয় । এই বই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন ওনার চিকিৎসক ও ভক্ত ডা: নিরোদ বরণ ।এই বইতে ঋষি অরবিন্দ কেবল সাবিত্রী ও সত্যবানের ঐশ্বরিক প্রেম কাহিনী ও যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনাকে তুলে ধরেননি । উনি বেদব্যাসের থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে এই বই রচনা করেন । রাজা অশ্বপতি , রাজনন্দিনী সাবিত্রী ও সত্যবানের জীবনকে কেন্দ্র করে যে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটে ও অলৌকিক স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণ হয় তাকে উনি তুলে ধরেন ও নিজের জীবনের স্পিরিচুয়াল পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে একটি ভিন্নস্তরের কাব্য সৃষ্টি করেন যা মিথকথন মোড়া ও রূপকধর্মী হিসেবে নতুনতর দিকে পা বাড়ায় । বেদব্যাসের মতন উনি কেবল সাবিত্রীকে একজন রূপবতী রাজকন্যে হিসেবে দেখাননি , বরং সৃষ্টির আদি ও প্রলয়ের মাঝে যে প্রকৃতির বিন্যাস তারই নারীরূপ সাবিত্রী, সেইভাবেই তুলে ধরেছেন । এই পুস্তক কোনো সাধারণ বই নয় ; এটি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ কিংবা কাশীরাম দাসের মহাভারতের মতন গভীর অধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভান্ডার যার স্তরে স্তরে রয়েছে বিবিধ রতন ও ধ্যানলিঙ্গের পরশ যা পড়লে

মনে হবে মানুষ যেন অতি সহজেই মৌনতায় প্রবেশ করছে ও নিজের শুদ্ধ চেতনার স্পর্শ পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে পরম সত্যের দিকে ।

সত্যবানের অর্থ এমন একজন যিনি সত্যের বাহক । কাজেই সত্য কী ? এই সত্য হল ঐশ্বরিক ।

যোগীরাজ অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে বেদব্যাস রচিত মহাকাব্যের ভেতরেও নির্ঘাত অধ্যাত্মিক ভাবধারার পরশ ছিলো যা কালের স্পর্শে মলিন হয়ে গেছে । উনি সেই দিকটাই সুগ্রন্থিত করেছিলেন ।

এখানে দেশ বলতে ঋষিরাজ অরবিন্দ বুঝিয়েছেন স্বর্গ বা সুক্ষ্ম কোনো লোক যা ঈশ্বর দ্বারা চালিত আর পার্থিব জগৎ হল আঁধারে ঘেরা এক লোক ।

দেশান্তরিত রাজকুমার বা যুবরাজের অর্থ হল মর্ত্যলোকে পাড়ি জমানো কোনো দেবতা যাঁর এবার তপস্যা করে মোক্ষ পথে ধাবিত হতে হবে । নরেশ অশ্বপতিকে উনি বলেছেন অধ্যাত্মিক শক্তির নরেশ । আর সাবিত্রী, তাঁর পিতা ও যুবরাজ সত্যবান ইত্যাদির এই পৃথিবীতে আগমণের ব্যাপারটিকে উনি বলেছেন এক প্রকার আলো হতে বিচ্যুতি বা

অন্ধত্ব অর্থাৎ দেবলোক থেকে ভূলোকে এসে সব ভুলে যাওয়া অর্থাৎ উল্টোপথে বিবর্তন ।

সাবিত্রী বইটি বিশেষ ছন্দে রচিত । মনন ও চিন্তনের অতীত বলে মনে হয় । কারণ এই কাব্যগ্রন্থ যেন এক অবর্ণনীয় সুমিষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি । পবিত্র বারিতে পা ডুবিয়ে হেঁটে চলা কোনো অদেখা তপোলোকে !

এই বই লিখেছেন এই মহাযোগী একদিনে নয় , সারাটা জীবনে । তপস্যার ফসল হিসেবে ।

ঈশ্বরের নির্দেশে । ঋষিরাঙা হয়ে । তাই সত্যবান যেমন ছিলেন অমর , স্বর্ণকলসের অমৃত পান করে সেরকম এই কৃষ্ণধূন জাতকের রচিত সাবিত্রীও হল অবিনশ্বর ; আর হবে নাই বা কেন দা মাদার , মীরা আলফাসা স্বয়ং বলেছেন যে এই মহাকাব্য হল এক সত্য যাকে বলা চলে আগামীদিনের সত্য ! এবং এই কাব্যগ্রন্থ এতই জীবন্ত ও প্রখর-রুদ্র যে ইন্টিগ্রাল যোগা পথের পথিকদের আত্মার ওপরে এই বই একটি সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে । যা যোগীদের হিলিং এর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম । অর্থাৎ সেই জ্যোতি ; যার স্পর্শ পেলে আর কিছুই ভালোলাগেনা । হিলিং , হিলিং আর হিলিং । এই হিলিং এর সর্বশেষ ধাপই হল মোক্ষ ।

নীলগ্রীবা , সদাশিব, ত্র্যম্বক , কৃত্তিবাস সেই মহাশক্তি যার দিকে ধাবমান সমস্ত যোগীগণ আবহমানকাল ধরে শান্তি চাইছেন- অথচ কৃপাসিন্ধু হলেও তাঁর কৃপা লাভ করতে সক্ষম খুবই মুষ্টিমেয় কয়েকজন । তাই সাবিত্রী যদি অর্থ বুঝে , ভক্তিভরে পাঠ করা যায় তবে তার শক্তি ও স্পিরিচুয়াল ব্যাখ্যা যোগীদের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তরী পার করাতে সক্ষম । সাধারণ বিবর্তনের সোপান ধরে গেলে যা করতে কোটি কোটি জন্ম লেগে যেতে পারে । এতই শক্তিশালী এই পুস্তক ।

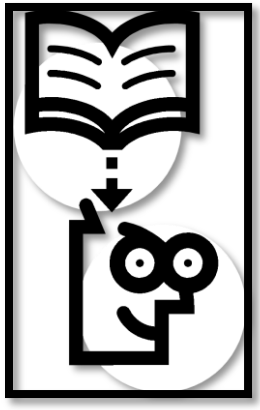

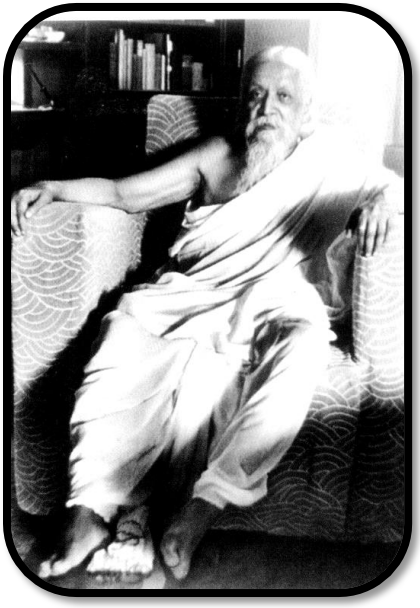

ঋষি অরবিন্দ

শিরিনের বাবা একটি কম্পিউটারের দোকান খুলেছিলেন যেখানে এসব বিক্রি করা হতো । তার নাম উনি দেন **অরো-বাইট** । তার গুরুর নামে ।

আবার ওরই নিজের কাকা ; দ্বার পরিগ্রহ করেননি । মুসলিম একজন যুবক হলেও আর ইরানে চার চারটি বৌ একই সাথে রাখা চলে তবুও উনি পন্ডিচেরি আসেন দাদার ভক্তি দেখে । এসে উনিও শ্রী অরবিন্দের যোগের সম্পর্কে জেনে এতই উৎসাহিত হন যে নামাজ পড়া ছেড়ে একজন যোগী হয়ে যান । উনি অর্থনীতি নিয়ে পড়েছিলেন । পরে বিদেশে মানে ফ্রান্সে থিতু হন এবং একটি কলেজে পড়াতে শুরু করেন । ফাঁকে ফাঁকে দা মাদার এবং ঋষি অরবিন্দের যোগ সাধনায় আত্মনিবেশ করেন ও তাতেই জীবন উৎসর্গ করেন ।

কেউ প্রশ্ন করলে বলেন , অনেক জন্ম তো অনেক ভাবেই কাটালাম , বিয়েশাদি করলাম , শেঁয়াল-বেড়ালের মতন বাচ্চা প্যায়দা করলাম , জগৎ এর মদ ও মাংসে ডুবলাম । এই জন্মটা আল্লাহ্ বা ঋষি অরবিন্দকেই না হয় দিলাম !

তার এই অধ্যাপক কাকার কাছেই শুনেছিলো শিরিন যে **শ্রী অরবিন্দ দু- দুবার নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হন । একবার সাহিত্যে ও অন্যবার**

শান্তিতে । তবে সেইসময় অত সহজে ভারতীয়রা এসব প্রাইজ পেতেন না । তাই হয়ত যোগীবর পাননি । কিন্তু তিনি ছিলেন বিশাল প্রতিভাধর ।

আর তাছাড়াও তিনি একজন রেবেল ছিলেন । হয়ত তাই দেওয়া হয়নি । অনেক সময় বিপ্লবীদের সমকালীন নানান সরকার ত্যাগ করেন ; রাজনৈতিক নানান কারণে । বিতর্ক এড়াতে । তবে তাতে ওনার মেধা ও কাজের ব্যাপ্তিতে কোনো ফিকে ভাব আসেনি । তাঁর কাজের ব্যাপ্তি ছিলো সুবিশাল ।

এবং চিন্তার স্রোত অত্যাধুনিক ।

হয়ত সমকালীন মানুষ বুঝতেও পারেনি ।

শ্রী অরবিন্দ ছিলেন সুশিক্ষিত একজন ঋষি, কাজেই তাঁর জীবনী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেখানে দৈব ও ভাগবতের পাশাপাশি ইন্টেলেজেন্সিয়ার ছাপও সুস্পষ্ট। এগুলি বারেবারে দেখা যায় । বিদেশে শিক্ষিত ও বহু প্রাইজ পাওয়া এবং ভালো ছাত্র হবার সুবাদে নানান বিষয়ে পারদর্শিতা থাকায় তার জ্ঞানের ভান্ডার ছিলো সুগভীর । তিনি বরোদায় শিক্ষকতাও করেন ও সেখানকার রাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন । উনি সংস্কৃত , ফরাসী ,

ল্যাটিন, গ্রীক ,ইংলিশ ইত্যাদি ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন । পর্ব ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার পুরোটা রসই উনি শুষে নিতে পেরেছিলেন । উনি মনে করতেন যে ভারতের স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হল এই মাটির আধ্যাত্মিক রস সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও তাকে ধরে রাখা । ঋষির রচিত বেদ, উপনিষদ , মহাভারত, রামায়ণ ও গীতার ওপরে রচনাগুলিই এর প্রমাণ । উনি বলে গেছেন যে আগামীদিনে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে এবং সেটা কেবল জড় জগতের বস্তুবাদ ইত্যাদির কারণে নয় সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও । **মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ছিলো পরমাআর সাথে মিলন কিন্তু বর্তমান সমাজ তা থেকে বহুদূরে চলে যাচ্ছে যাকে বিদেশের ভাষায় বলা হয়ে থাকে অ্যান্টাই ক্রাইস্ট সোসাইটি । ক্রাইস্ট কিন্তু যীশু খ্রীস্ট নন , ক্রাইস্ট একটি কনশাস্‌নেসকে বলে যাকে আমরা বলি পরম ব্রহ্ম । জৈনগণ বলেন অরিহন্ত আর বৌদ্ধরা বলেন দা বুদ্ধা ।**

কিন্তু ভারতের স্পিরিচুয়ালিটি আবার অগ্রদূত হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই সর্বোচ্চ সোপানের দিকে যার অন্য নাম ওভারসোল বা পরম আআ । তারই দিকে ফিরে যাওয়া আমাদের সবার

লক্ষ্য । সেই কারণেই বারে বারে ফিরে আসা এই জগতে । ইচ্ছে অথবা অনিচ্ছেতেই হোক্ না কেন ।

তাঁর সৃষ্ট যোগের নাম ইন্টিগ্রাল যোগা ।

এই যোগের মাধ্যমে মানুষের এমন বিবর্তন হওয়া সম্ভব যাতে আমরা-আধুনিক যুগে যা যা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা জাতিগতভাবে সমাধান করতে সক্ষম হব । কারণ জগৎজুড়ে যা চলেছে তা আমাদের মননের পক্ষে বড্ড বেশি ধারালো কিংবা ভারী হয়ে যাচ্ছে । আমাদের নিজেদেরকে বদলে নিতে হবে । সেটা তো মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন যে এত যে মানসিক ব্যাধি তার অনেকটা কারণ এই যে আধুনিক যুগের এত তথ্য ও তত্ত্বগুলি আমাদের মগজ নিতে সক্ষম হচ্ছে না , প্রসেস করতে পারছে না তাই অনেকেই মানসিক রুগীতে পরিণত হচ্ছেন । সাবিত্রী পঠন পাঠন ও ধ্যানের মাধ্যমে , ইন্টিগ্রাল যোগার মাধ্যমে হয়ত আমরা অনেক তাড়াতাড়ি নিজেদের সত্ত্বাকে শানিয়ে নিতে সক্ষম হবো বিবর্তনের পথে । এই কথা বহু বহু যুগ আগে ঋষি অরবিন্দ বলে গিয়েছেন । আজ আমরা ঘরে ঘরে উন্মাদ দেখছি । আমাদেরই ভাই ও বোন অথবা নিজেরাই অ্যান্টাই অবসাদের ওষুধ খেয়ে কাজে যাচ্ছি কারণ কাজ না করলে সংসার চলবে না এমন

অবস্থায় এসে গেছে সমাজ আজ ।ভারত মুণি-ঋষিদের দেশ । এখানে পথের কোণায় কোণায় মন্দির ও ঘরে ঘরে যোগা ও ধ্যানের ভান্ডার কিন্তু এই মণিষী আমাদের অন্যজাতের এক যোগ সাধনার সন্ধান দিয়েছেন যার নাম এই ইন্টিগ্রাল যোগা বা সুপ্রামেন্টাল যোগা । অর্থাৎ উনি এমন এক যোগ সাধনার কথা বলেছেন যা কিনা বলে যে আমরা তো পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়ে আসি কিন্তু কেন ? সমস্ত যোগসাধনা আমাদের শেখায় যোগের দিকে যেতে আর পরম ব্রহ্মের সাথে মিশে যেতে । অর্থাৎ যুক্ত হয়ে যেতে । কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যাকে শিরিন বাবা বলে সম্বোধন করে থাকে এবং বহুবার তাঁর সাথে ওর কথা হয়েছে ও দেখা হয়েছে ওনার সুক্ষ্ম দেহে সেই ঋষি ওকে বলেন যে এই যোগকে উল্টোদিক থেকে দেখো । কেন আমরা বিয়োজিত হয়েছি ? সেটা ভাবো । ইভোলিউশান তো হয় কিন্তু কেন আমরা আমাদের দৈব স্বভাব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছি ? এই সুপ্রামেন্টাল যোগের সাহায্যে মানব জাতি আবার তার বিবর্তনের মাধ্যমে দৈবভাব খুঁজে পাবে ও পৃথিবীতে ভারসাম্য ফিরে আসবে । এই জন্য তিনি সুপার মাইন্ডের কথা ব্যক্ত করেছেন । এই সুপার মাইন্ডের স্পর্শ পেলে মানুষ সহজেই দানবীয় কাজ করা থেকে বিরত থাকবে ও ঐশ্বরিক

হয়ে উঠবে । বর্তমানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে বহু মানুষ- দানব, দৈত্য , পিশাচ ও অন্যান্য নিম্নস্তরের চেতনাদের আহবান করে এনে নিজেদের শখ মেটাচ্ছে ও তাতে সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে , মনের সুক্ষ্ম স্তরে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে । **একে তন্ত্রের ভাষায় বলে , বিকৃত তন্ত্র ।** আবার মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিবর্তন খুব দীর্ঘ পদ্ধতি ও সময় সাপেক্ষ কিন্তু ইন্টিগ্রাল যোগার মাধ্যমে মানুষ থেকে দৈবিক খুবই কম সময়ে হয়ে ওঠা সম্ভব । ঋষি অরবিন্দের এই পদ্ধতি, পরীক্ষিত ও দৈব নির্দেশিত সমগ্র মানব সমাজের জন্য ।

সুপার মাইন্ডের পরশে খুবই কম সময়ে যোগীরা বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে সক্ষম হবেন পরাব্রহ্মের নিকটে ।

এই সুপ্রামেন্টাল যোগা এই ধরিত্রীকে কেবল সুন্দরই করবে না, স্থায়ী শান্তি আনবে । বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্ম ও জাতি নিয়ে হানাহানি ও কাটাকাটি , অশ্লীলতা , নারীদের নির্যাতন এমনকি শিশু ধর্ষণের মতন ক্রুরতা ইত্যাদির সমাপ্তি ঘটবে এই যোগা শিখে যদি সকলে দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আনে ।

আধুনিক যুগে সবচেয়ে প্রয়োজন যৌন সংহারের । -কচি কচি শিশু, গৃহপালিত পশু ,গৃহহীন ভিখারিনী ,বৃদ্ধাবাসের বৃদ্ধা ও হাসপাতালের রুগী কাউকেই আমরা বাদ দিচ্ছিনা বিকৃত যৌন অত্যাচার থেকে ।

তার মানে কি দাঁড়ালো ? আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে গেছে । বাঁদরের মতন । আমাদের শান্ত হতে হবে । আর এই যোগা মনকে শান্ত করবে , উন্নত করবে ও আমাদের প্রকৃত রূপ যা অর্থাৎ ঐশ্বরিক রূপ তা প্রস্ফুটিত করবে । তার চেয়েও বড় কথা শিরিনের যা মনে হয় যে ঋষি অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ; এমনদিনও আসবে যে কেবল মেয়েমানুষ নয় শিশুরা /পশুরা/রুগীরাও জঘন্য লোভ থেকে বাঁচবে না তাই উনি হিমালয়ের গুহায় বসে নয়, বাস্তববাদী একটি সমাধান দিয়ে গেছেন যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং বিবর্তনের পথে আমরা এগিয়ে গিয়ে সুস্থভাবে বাঁচতে পারি । তাই এই সুপ্রামেন্টাল যোগা করার জন্য বনেজঙ্গলেও যাবার দরকার নেই । নেই কোনো গুরুবাদের ঈশারা!

-কানের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌, বছর বছর আমায় দিস্‌ ইত্যাদি !!

ধ্যান করো ও এগিয়ে চলো নিজের পথে ।

শোনা যায় ঋষি দেহত্যাগ করার পরেও ওনার দেহ অবিকৃত ছিলো অনেকদিন পর্যন্ত । অপরূপ এক জ্যোতি ছিলো ওনার দেহের চারপাশে ।

যোগীরা এমন করতে পারেন । ওনার দেহ থেকে এমন তরল বার হয়েছিলো যা থেকে সুগন্ধ বেরিয়েছিলো অথচ মেডিক্যাল অনুসারে হত উল্টো ; তাঁর অসুখ যা হয়েছিলো তাতে।

যোগীরা নিজেদের ইচ্ছেই মৃত্যুবরণ করতে পারেন । একটা সময় শ্রী অরবিন্দকে সমাধিস্থ করা হয় নিয়ম মতন কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে আজও কবর খুঁড়লে দেখা যাবে যে উনি সেই আগের মতনই শুয়ে আছেন কফিনের মধ্যে ! দেহ একটুও বিকৃত হয়নি ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আবার শ্রী কৃষ্ণ । অর্থাৎ হিন্দুদের লড়াকু ভগবান । ওয়ারিয়র গড যাকে বলে । তাই উনি জেলেও ছিলেন । জেলে থাকাকালীন উনি কৃষ্ণের দর্শন পান । পরে উনি পন্ডিচেরি চলে যান । তখন পন্ডিচেরি ছিলো

ফরাসীদের শাসনে । জেলে থাকাকালীন ওনার সাথে অনেক দৈবশক্তির দেখা হয় । যেমন ঐ জেলেতেই কৃষ্ণের দেখা তো পেতেন উনি । স্বামী বিবেকানন্দ ওনার সাথে কথা বলতেন ওখানে । মনে মনে । তখনই ওনার অন্তরে এক অধ্যাত্মিক জাগরণ হয় ।

পরে বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামক একজন যোগী ওনাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যান ।

--- কাঁপে কাঁপে, আমার হিয়া কাঁপে

একি যে কান্ড , একি যে কান্ড

একি কান্ড , সব পন্ড , এ ব্রহ্মান্ড

শুন্য লাগে

তুমি ছাড়া শুন্য লাগে ।

কাঁপে কাঁপে , আমার হিয়া কাঁপে ---

আমাদের মোহিনের ঘোড়াগুলির শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গানের মতন অবস্থা তখন শ্রী অরবিন্দের !

দেশের ও দশের জন্য লড়াই শেষ । দুনিয়া বদলে গেলো লেলেজীর পরশে । শ্রীকৃষ্ণের যেমন গুরুজী ছিলেন সন্দীপনী সেরকম যুবক বিপ্লবী, অরবিন্দ ঘোষের ভুবন জুড়ে এসে বসলেন এই লেলেজী । ইনিই স্থির হয়ে বসতে শেখালেন আধুনিক যুগের মোহন বাঁশিকে ।

বললেন , অনেক তো হল ! এবার বন্দুক ছেড়ে বাঁশি তুলে নাও হাতে ।

শেখালেন, মানব দেহের সুক্ষ্ম শরীরের নাদ ।

কূল কুন্ডলিনী, ব্রহ্মরন্ধ্র ও ইড়া- পিঙ্গলার রহস্য ।

বললেন , তোমার কোনো বাহ্যিক গুরুর দরকার নেই । অন্তরেই আছেন পরম ঈশ্বর কিংবা চেতনা যিনি সবার গুরু । তারই আরাধণা করো । উপসনা করো তাহলেই প্রকৃত কেষ্ট লাভ করতে পারবে ।

সেই থেকেই পা ফেলা আরম্ভ **ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যের** দেশে । **আদি শঙ্করের তত্ত্ব ও ভগবৎ গীতার আলোতে দেখে নিলেন তন্ত্রের মহিমা - দশমাতৃকার দশ ভৈরব সাধনার পথে পা দিয়ে ।** বুঝলেন সবই যোগের দ্বারা সম্ভব ।

তাই নিজ পন্থা দিয়ে গড়ে তুললেন সুপ্রামেন্টাল যোগ সাধন পদ্ধতি ।

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ।

ওনার বহু শিষ্যের ভেতরে এক সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন দিলীপ কুমার রায় , শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র ও সঙ্গীতকার ও নাট্যকার যিনি ওনাকে নিয়ে অনেক লিখেছেন । আরো বহু ঋদ্ধ ও সিদ্ধ মানুষ ওনার সাহচর্য পেয়েছেন যেমন শ্রী চিন্ময় ।

অরবিন্দ আশ্রম ও অরোভিলের প্রতিষ্ঠা করেন দা মাদার । উনিও শক্তিময়ী ও ভক্তিমতী ছিলেন ।

দা মাদার অথবা মীরা আলফাসা আসেন বিদেশ থেকে । শোনা যায় ওনার জন্ম হয় প্যারিসে এক ইহুদি পরিবারে। যৌবনে উনি আলজেরিয়াতে চলে যান আধিভৌতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয়ে একজন বন্ধুর সাথে যার নাম ম্যাক্স থিওন্ । পরে দেশে ফিরে উনি কিছু মানুষকে স্পিরিচুয়াল পথে গাইড করেন ।এরপরে উনি ভারতে আসেন । ঋষি অরবিন্দের সাথে দেখা করেন । ওনাকে গুরু মানেন কারণ তাঁকে নানান সময় দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং তাঁর গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার

করেন । এখানে বলে রাখা ভাল যে আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে যে পৃথিবী ব্যাতীত যেসব অন্যান্য জগৎ আছে যেমন স্বর্গ একটি আর তার থেকেও উচ্চস্তরের আরো জগৎ-সেখানে বাস করেন দেবদেবী ও মুণিঋষিগণ আর তাদের কেউ সাধনারত তো কেউবা নানান কাজে লিপ্ত যেমন ইন্দ্রের কাজ স্বর্গের দায়িত্ব বহন করা বা বরুণ দেব জলের ব্যাপার দেখেন , ভগবান শিব সংহার করে থাকেন ইত্যাদি কিন্তু সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল মোক্ষ পাওয়া এবং পরম ব্রহ্মে মিলে যাওয়া । কিন্তু মোক্ষ পেতে গেলে দেবদেবী , মুণিঋষি ,যক্ষ , গন্ধর্ব দেরও এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয় কর্ম কাটানোর জন্য ।

এই জগৎ-ই হল একমাত্র জায়গা যেখানে পাতাল, তলাতল এমনকি স্বর্গ ইত্যাদি থেকেও আআরা জন্ম নিতে পারে ও একইসাথে বসবাস করতে সক্ষম তাই মোক্ষপথে যেতে গেলে এই ধরায় আসতেই হয় । তবে এটা জরুরি নয় যে তাকে মানুষ হয়েই আসতে হবে । ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে সে সারমেয়, গরু, পাখি এমনকি বেজি হয়েও জন্ম নিতে পারে । যেমন জটায়ু একজন পক্ষী কিন্তু আদতে দেবতা । ডেমি-গড । উপদেবতা ।

তাই ঋষি অরবিন্দ যদি কৃষ্ণ হন ও মোক্ষ পথে ধাবিত হবার জন্য ঋষি হয়ে জন্ম নেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই । আর শিব, ব্রহ্মা,লক্ষ্মী-- এঁরা স্থায়ী কোনো দেবদেবী নন । এগুলি হল এক একটি পোস্ট । এঁরাও মারা যান । একটা সময় এনারাও দেহত্যাগ করেন এবং সাধনার ফলস্বরূপ মোক্ষপথে এগিয়ে যান । আর তাঁর ফেলে যাওয়া দেব অথবা দেবীর পোস্টে এসে বসেন অন্য কোনো সাধক । পুরোটাই নির্ভর করে সাধকের বাসনা , তাঁর আত্মার পবিত্র গতিপ্রকৃতি , তাঁর পিতৃপুরুষ ও কর্মের ওপরে ।

আর জগৎ তো একটি নয় ; অজস্র জগৎ ও সেখানে নামরূপ , মায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু , শিব, কৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য আছেন । এঁরা সংখ্যায় একজন নন । এঁরা এসেছেন কেবল একই সোর্স থেকে যা হল পরম ব্রহ্ম বা আল্লাহ্ বা গড্ । ঋষি অরবিন্দ যে কৃষ্ণ তার একটা বড় প্রমাণ হল উনি ছিলেন একজন সেনানী । **ওয়ারিওর গড ও সিদ্ধপুরুষ ।** এবং বলাবাহুল্য গীতা অনুবাদ ও এই নিয়ে অনেক আলোচনা উনি করেছেন যা আজও সমান আদরনীয় । ওনার গীতার ওপরে লেখাগুলি অত্যন্ত গভীর । আগেই বলেছি শ্রী চিন্ময়ানন্দ ছিলেন ওনার সান্নিধ্যে । উনি একজন গীতাপন্ডিত ও সাধু

। মজার ব্যাপার হল ঋষি অরবিন্দের পিতার নাম ছিলো **কৃষ্ণধূন** ঘোষ ও গুরুর নাম **বিষ্ণ** ভাস্কর লেলে । জন্মদাতা পিতা ও আধ্যাত্মিক পিতা দ্জনের নামই শ্রীহরির নামে আর হরি নামের মধু যে জেনেছে তাকে কি আর সংসারে আটকে রাখা যায় ? কাজে কাজেই তিনি পাড়ি জমালেন সমস্ত আন্দোলন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আলোড়ন ত্যাগ করে অনন্তের পথে, যেই পথে আছে অসীম শান্তি ও আনন্দ আর আমরা তা ভুলে গিয়ে এই জগতে এসে জড়িয়ে পড়ছি, মায়াতে, আর বারবার ফিরে আসছি সেই মোহের টানে ,এক জাদু দন্ডের ছোঁয়ায় এই পার্থিব লীলাক্ষেত্রে , আদতে রাত্রি রাজকন্যে সেই জাদু দন্ড সরিয়ে নিলেই আমরা ফিরে যাচ্ছি অমরত্বে ; গভীর ঘুমের সময় কিন্তু সেটা তো স্থায়ী নয় তাই ভুলে যাচ্ছি ঘুম থেকে উঠেই । **চোখ বুজলেই ঈশ্বর আর খুললেই সৃষ্টি !**

শ্রী অরবিন্দ বা শিরিনের বাবা তাই গবেষণা করে বার করেছেন যে মায়াতে বাস করেও কিকরে সেই শান্তির মাঝেও অবগাহন করে থাকা যায় অন্ততঃ আমাদের মানবজমিনকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত রাখতে ।

আর তাই আমাদের প্রিয় গায়ক শিলাজিৎ যখন গেয়ে ওঠেন ;

লাল মাটির সরানে

মন আমার রইলো পড়ে জামবনে আর নদীর পাশে

নীল আকাশে,

যেখানে ধূলোয় মাখা রইলো পড়ে তোর চিঠি --!!

----গেঁয়ো নদী ডাকছে আমার বুকের ভেতর কান্না
পাথর , আমার আর রাখাল সাজা হলনা ;

লাল মাটির সরানে !!

তখন বুক ফাটে । বলতে ইচ্ছে হয় যে অরোভিলে ডাকছে তোমায় শিলাজিৎ , এসো , তুমুল ঝড়ে কুড়িয়ে নাও শিল আর হও রাখাল রাজা আর তোমার জন্য বসে আছে রাইকিশোরী তার বেণু নিয়ে , এসো শিলাজিৎ ! দেখো এখানে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে । কোনো কিছুর শেষ নেই আর শুরুও নেই । এসো , ভালোবাসো ও খুঁজে নাও তোমার ইচ্ছেগুলো , প্রাগৈতিহাসিক মনে সুগ্রন্থিত সেই গোধূম বর্ণা , আম্রমুকুল কুড়িয়ে ফেরা দস্যি মেয়েকে । **প্রেম ব্যাতাত কি বিবর্তন হয় ??**

সেই বিখ্যাত কবিতা কি মনে পড়েনা ?

শিরিনের তো পড়েছে ,এক ভারতীয় বন্ধুর কাছে শোনা ;

ভগবান তুমি দূত পাঠায়েছ বারেবারে

দয়াহীন সংসারে ।

তাঁরা বলে গেলো ক্ষমা করো, ভালোবাসো ,

অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো ।

বর্তমানে রামমন্দির নিয়ে যেই হিংসার কথা শুনছে তাতে মনে হয় যে ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে ধারণ করে শান্তির পথে নিয়ে যাওয়া ; এইরকম ভয় দেখিয়ে ও অহেতুক নির্যাতন করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া নয় । সন্ত্রাসবাদের জবাব কি উগ্রপন্থা দিয়ে দেওয়া যায় ? কখনো না । কিন্তু ইদানিং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর দেশে সেরকমই হচ্ছে । শিরিনের অবশ্যি মনে হয় মন্দির মসজিদ না করে ঐ বিতর্কিত স্থলে একটি সুন্দর ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে তোলা উচিৎ । ক্রিকেট তো ভারতও খেলে আর পাকিস্তানও খুবই উন্নতমানের খেলে । কাজেই কেউই আর এই নিয়ে সন্ত্রাসের পথে যাবেনা । **কিন্তু এটা শিরিনের একান্তই নিজস্ব মত ।**

আজকাল কেবল মুসলিম আর হিন্দুরাই নয় সন্ত্রাসবাদের পথে বৌদ্ধ্যদের মতন শান্তির পথ দেখানো ধর্মের মানুষও চলেছে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘম শরণং গচ্ছামি ;

এতে যেন নতুন একটি পংক্তি যোগ হয়েছে , **হিংসাং শরণং গচ্ছামি !**

যেই বৌদ্ধ্যধর্ম শেখায় ; লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট-তারাই অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আগামীদিনের কথা মনে করে।

ভুলে গেছে যে ফিউচার উইল টেক কেয়ার অফ ইটসেল্ফ।

যেমন শ্রীলঙ্কায় কিছু বৌদ্ধ্য উগ্রপন্থার কথা শোনা গেছে যারা নানান হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে আবার বর্মায়, বৌদ্ধ্য সন্ত্রাসবাদের খবরও শোনা গেছে। ৯৬৯ নামক সংগঠন এইসব কাজে যুক্ত এবং ৯৬৯ বৌদ্ধ্যদের পবিত্র ধর্মীয় সংখ্যা। শিরিনের বক্তব্য হল এইসব কর্মকান্ডের পেছনে হয়তবা কোনো গুহ্য বিষয় থাকতে পারে যা

মানবিক ও জাতীয় সম্পর্কের সাথে যুক্ত কিন্তু ধর্মকে এর সাথে না জড়ানোই ভালো । কারণ ধর্ম অনেক গভীর একটি শব্দ ও ব্যক্তিগত বিষয় । কাউকে জোর করে তার ধর্ম পরিবর্তন করা যেমন অনুচিত সেরকম কেউ নাস্তিক হলে তাকেও ধার্মিক করবার বিশেষ কোনো কারণ দেখেনা শিরিন বরং নিজের ভেতরের যেই সততা , সহনশীলতা ও গভীরতা আছে তাকেই সম্বল করে মানুষ বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় । অযথা কোনো ধর্মকে অন্তর থেকে বিশ্বাস না করে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থেকে লাভ নেই । মানবিক ধর্মই একটি ধর্ম বটে- না কি ? সেই ধর্মতেই পারঙ্গম হোক না আগে ! আর সেখানেই আসে অরোভিলের মতন একটি নগরের উৎপত্তির কথা । নিজের মতন করে বাঁচা । স্বাধীনভাবে বাঁচা । সৎ চিন্তাভাবনা করা । উচ্চস্তরের কল্পনা করা । এই তো জীবন ! **দুনিয়ার সমস্ত মহামানব বলে গেছেন একই কথা , সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপণ করো ।**

পরমাত্মা হলেন এক মহাশক্তি যাঁর থেকে রিচার্জ হয়ে আমরা এই জীবজগৎ ও গাছপালা আবার নতুন উৎসাহে সৃষ্টিতে ভাসি । সেই মহাশক্তিতে অবগাহন করতে গেলে বিশেষ কোনো কোম্পানির প্লাগ ও তার লাগবে কেন? যেকোনো যোগ্য ইলেকট্রিক

তারই কাজে দেবে তাই না ? পরমেশ্বর বা আল্লাহ্ তো কোনো **ইনকর্পোরেশান** নন যে তাঁর জন্য মার্কেটিং বা সেলস্ টিম লাগবে ! তিনি সবার হৃদয়ে আছেন ---যে শুদ্ধ মনে আহ্বান করবেন তার কাছেই আসবেন !

ঋষি অরবিন্দ ও দা মাদার

শ্রী অরবিন্দ, **ভারত ও পাকিস্তান আবার যোগ হয়ে যাবে** তা বলে গিয়েছেন । যেমন এখন বলা হচ্ছে যে পাকিস্তান এসে ভারতের সাথে সংযুক্ত হবে আর তাতে বড় ভূমিকা নেবেন স্বয়ং ইমরান খান সেসব ভবিষ্যৎ বাণী ঋষি অরবিন্দ করে গেছেন(ইমরান খান-টা বাদ দিয়ে) । উনি সন্ন্যাস নেবার পরেও কেবল দেশের কথা মনে করে, নানান সময় নিজে পত্র লিখে অথবা নিজের মঠের ভক্তদের প্রেরণ করে, দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, ভারতের সার্বিক মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে এবং বলেছেন যে **এই দেশের পরিচয় ; তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আধ্যাত্মিক সুর বয়ে চলেছে তার ওপরেই নির্ভর**

করে আর কিছু নয় । এই স্পিরিচুয়ালিটিই ভারতের হৃদয় ও স্পন্দন । তাকে বাদ দিলে আর ভারত বলে কিছু থাকেনা ।

এবং ---আমাদের দেশ হয়ত হিন্দুদের দেশ ও পাকিস্তান ইসলাম ধর্মের দেশ কিন্তু দুই ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক তফাৎ থাকলেও সুগভারে অনেক মিল আর হবে নাইবা কেন ? সমস্ত ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিক দর্শনই তো আমাদের অন্তরের গুহ্যকালীকে দেখতে শেখায় । নামরূপ যাইহোক তাঁর ! কেউ বলে মা কেউবা বাবা আবার কেউ শুধু জ্যোতি অথবা ব্রহ্ম চেতনা ! কাজেই ভারত ও পাকিস্তান যদিও বিভাজিত হল ধার্মিক কারণে কিন্তু একটা সময় আসবেই যখন মানবজাতি উন্নত হয়ে বুঝতে শিখবে যে বাহ্যিক যেসব বিভেদ আছে তা একান্তই মোটাদাগের আর আমরা হৃদয়ের গভীরে সেই একই আলোর স্ফুলিঙ্গ ও ঐশ্বরিক অবয়ব প্রত্যেকে । তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের আর ভিন্ন করে রাখা যাবেনা । আমরা সবাই ভাইবোন । আমরা একইসাথে মিলেমিশে থাকবো ।

ভারতবর্ষ দ্ই হাত মেলে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছে । ইহুদি, খ্রীস্টধর্ম সকল ধর্মের মানুষই

এখান ঠাঁই পেয়েছে । আর এই দেশ হল প্রধান পাঁচ-ছয়টি ধর্মের জন্মদাত্রী ।

হিন্দু, বৌদ্ধ্য , জৈন, শিখ , ব্রাহ্ম ,বৈষ্ণব ।

আরো কতনা শত সহস্র আদিবাসী/উপজাতি ধর্ম আছে তার তো কোনো ইয়ত্ত্বা নেই ।

কাজেই সহনশীলতার অভাব নেই । তাই বিভাজন যেমন করা হয়েছে সেরকম একটা সময় সংযোজনও হয়ে যাবে । আর আজ দেখো **মহাযোগীর সেসব বাণী সত্য হতে চলেছে ।**

শিরিন ; ঋষি অরবিন্দর জীবন নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে যা বুঝতে পেরেছে তা হল উনি আমাদের সবাইকে **উন্নত এক স্তরে নিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ,** বিবর্তনের পথ ধরে, প্রাকৃতিক উপায়ে যেতে গেলে যাতে সহস্র বছর লেগে যাবে । এছাড়াও এই মহান যোগী, আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এক যোগের সৃষ্টি করেন তাতে আধুনিক যুগের মানবজাতির কেবল অধ্যাত্মিকই নয় দৈহিক ও মানসিক সুকল্যাণ সম্ভব এবং সর্বোপরি এই ঋষিবর আমাদের দেশেই কেবল নয় অরোভিলে গ্রামের কথা নিজের মননে নিয়ে এসেছিলেন দিব্যদৃষ্টির

দ্বারা এবং এর উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের মানব সমাজে ধর্ম ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা । আমাদের ঐশ্বরিক করে তোলা । অর্থাৎ নিজেদের স্বরূপ যা আমরা মায়াজালের প্রকোপে ভুলে গেছি কিংবা ভুলতে বসেছি তাকে আবার পুন:রজ্জীবিত করে প্রতিটি মানুষকে তার সঠিক মূল্য বুঝিয়ে ,দেবত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া । **আমরা সবাই দেবতা , মানুষের মোড়কে । মানুষ ; অসুরের মোড়কে নই ।**

এই হল ঋষি অরবিন্দের ফিলোসফি। **ইন আ নাটশেল ।**

অরুণাচল পাহাড়

অরুণাচল

অরোভিলে থেকে শিরিন এলো অরুণাচলে । ১০০ কিমি মাত্র হবে । ওখানেই শুনেছে এই স্থানের কথা । খুবই পুরনো একটি দৈবস্থান । **পৌরাণিক দৈব ঢিবিকে লোকে অর্চনা করে আল্লাহ্ হিসেবে ।**

সে শিয়া মুসলিম তাই দুই হাত পাশাপাশি রেখে প্রার্থনা করতে শিখেছিলো শৈশবে যদিও তারা এখন সবাই ঋষি অরবিন্দের ভক্ত তবুও তার ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটি রয়ে গেছে । সে শ্রী অরবিন্দের সামনেও এবং অরুণাচল পাহাড়ের সামনেও দুই

হাত পাশাপাশি রেখে শিয়া মুসলিমদের মতন ; নামাজ পড়ার মতন করে প্রার্থনা করে ।

তাকে কেউ বকেনি এরজন্য । বন্ধুরা বলেছে , সর্বধর্মসমন্বয় এর চমৎকার উদাহরণ ।

পন্ডিচেরি থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার হবে দূরত্ব থিরুভান্নামালাই গ্রামের । এখানে অরুণাচল পাহাড় অবস্থিত । ওরা বলে তিরুবান্নামালাই । ত্রিকোণাকৃতি পাহাড় , আমরা ছেলেবেলায় যেমন পাহাড় আঁকতাম ড্রয়িং খাতায় ঠিক সেরকম । কিন্তু এই পাহাড় হলেন স্বয়ং পরমাত্মা । অনেকে শিবও বলে । **তবে এই শিব কিন্তু সেই মহেশ্বর নন যিনি মানব সমাজকে যোগ শিখিয়েছেন , বরং ইনি হলেন পরাব্রহ্ম বা আল্লাহ্ বা ক্রাইস্ট কনশাস্‌নেস্ ।**

লালচে পাথরে তৈরি এই পাহাড়ে, পায়ে হেঁটে মানুষ উঠে চলেছে শিখরের দিকে । অনেক ঝর্ণা ও গুহা আছে এখানে । সরু নদীও বুঝি দেখা যায় । প্রাচীন কাল থেকে বহু মুণিদের বাস এখানে ।

ব্রহ্মা , বিষ্ণু ও শিবকে নিয়ে একটি পৌরানিক গল্পও আছে । তবে সেটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় ।

একে সাধকেরা বলে শিবের অগ্নি লিঙ্গ । তাই এর রং লাল । এই পাহাড়ের প্রতিটি লিঙ্গই এক একটি শিব লিঙ্গ ।

এখানে বহু তপস্বী পুরাতন কাল থেকে সাধন ভজন করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, গুহায় নমঃশিবায় , গুরু নমঃশিবায়, বিরূপাক্ষ দেব , শেষাদ্রী স্বামীগল্ এবং হালের শ্রী রমণ মহর্ষি ।

এইসব সন্ন্যাসীদের নামে গুহাও রয়েছে এই পাহাড়ের উপরে । **একটি গুহা আছে ওম্ আকারে** । অজস্র পশু ও পাখি দেখা যায় এখানে কিন্তু শোনা যায় যে তাঁরা অনেকেই সাধক যাঁরা জানোয়ারের রূপ ধারণ করে জীবন যাপন করছেন তাঁদের কর্মের কোনো অংশ কাটাবার জন্য । শিরিন আগে খুবই অবাক হলেও, এখানে **শ্রী রমণ মহর্ষির** আশ্রমে গিয়ে দেখে যা অরুণাচল পাহাড়ের পাদতলে অবস্থিত যে সেখানে অনেক পশুপাখির সমাধি রয়েছে । **যেমন কাক , হরিণ , সারমেয় ও একটি গরু ; যার নাম লক্ষ্মী ।** এর মধ্যে লক্ষ্মীর নাকি মোক্ষ লাভ হয়ে যায় । সে আদতে আগের জন্মে ছিলো এক কাঠ কুড়ানি যে অরুণাচলে কাঠ কুড়িয়ে খেতো । সেইসময় শ্রী রমণ ছিলেন একজন কমবয়সী সন্ন্যাসী । উনি পাহাড়েই বাস করতেন ।

কোনোদিন খাবার জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। কিন্তু এই দরিদ্র মহিলা সেইসময় মহর্ষিকে না দিয়ে খাবার খেতেন না। বলতেন , **বাছা তুমি আগে খাও তারপর আমি খাবো।**

তাঁর যা জুটতো, তাই তিনি মহর্ষিকে, সন্তানের মতন দিয়ে খেতেন। পরে তাঁর কোনো অসুখ করে। খুব সম্ভবত: ব্রেস্ট ক্যান্সার। কিন্তু তিনি কোনো চিকিৎসা না করে- কেবল মহর্ষির ভরসায় থেকে জীবন দেন। পরের জন্মে উনিই নাকি এই গাভী মাতা হয়ে জন্ম নেন ও শ্রী রমণের কৃপায় মরণের সময় মোক্ষ পেয়ে যান।

তাঁরই সমাধি আছে আশ্রমে।

এছাড়াও মহর্ষির একজন সেবক ছিলো; মাধব স্বামী নাম তাঁর। তিনি মারা যাবার পর একটি শ্বেত ময়ূর হয়ে জন্ম নেন। বরোদার মহারাণীর ঘরে জন্ম নেন এই ময়ূর। এই রাণী ছিলেন মহর্ষির ভক্ত। পরে তিনি এই শ্বেতময়ূরটিকে দান করেন আশ্রমে।মাধব স্বামীর আচার আচরণের সাথে তার আচার আচরণ মিলে যেতো। মাধব স্বামী যেখানে বসতেন ময়ূরটিও সেখানে বসতো ও বসে খেতো। মহর্ষির পায়ে মাথা ঘষতো। পরে ভক্তরা রমণ মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করেন যে এই শ্বেতময়ূরটি, মাধবস্বামী

কিনা এবং উত্তর পাননা যে হ্যাঁ ,এরা দুজন একই আবার নাও এক নয়। **আর ময়ূরটিকে মহর্ষি , মাধব বলেই সম্বোধন করতেন । মাধব স্বামীর মতন বাদ্যযন্ত্রের ওপরে নিজের ঠোঁট দিয়ে এই ময়ূর টুংটাং ও করতো । এই নিয়ে রমণ আশ্রমের ভিডিও আছে ইউ-টিউবে ।**

শিরিন আগে এরকম শোনেনি । ও তেমন ধার্মিক তো নয় কিন্তু এক বন্ধু বলেছিলো **যে পাপ করলে কোনো পশু হয়ে জন্ম নিতেও পারে মানুষ** কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি । তবে এখন জানতে পেরেছে **যে পশু বা পাখি যোনি যেমন -কুকুর যোনি কিংবা শেঁয়াল বা বেড়াল ইত্যাদি যোনিতে জন্ম নিলে মানুষের অহংকার কমে যায় আর তাতে অধ্যাত্মিক উন্নতিতে সুবিধে হয় । হয়ত তাই এঁরা গাভী কিংবা পাখি হয়ে জন্ম নিয়েছেন ।**

অরুণাচল পাহাড় এক পবিত্র পাহাড় । শত শত বৎসর থেকে এই পাহাড়ের আকর্ষণে ছুটে আসছেন সাধু মহাত্মারা কারণ এখানে বিশেষ তপস্যা করতে লাগেনা । মনে মনে এই পাহাড়ের কথা ভাবলেই মোক্ষ সম্ভব ।

এই পুণ্যজ্যোতি হল মাঝখানে আর ঠিক তাঁর মধ্য থেকেই জন্ম হয়েছে শত সহস্র ঢেউ এর বা আলোক মালার । যা জীবন্ত । যার নিজস্ব চেতনা আছে । অনেকটা আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য সামান্য একটি বস্তুর কথা বলা যাক্ ! যেমন কচ্ছপ ধূপ তো সবাই দেখেছে ! মাঝখানে একটি স্থান থেকে গোলাকৃতি ভাবে ধূপের অংশ বের হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় আর শেষ একটা জায়গায় ওর মুখটা থাকে যেখানে আমরা অগ্নিটা জ্বালাই ।

ঠিক সেরকম ; পরমাত্মার চেতনা একদম মধ্যেখানে আছে । সংরক্ষিত ও অচল । সেখান থেকে বার হয়ে এসেছে এই সুবিশাল ব্রহ্মান্ড । গোল আকারে । **আমাদের মূল বসবাস সেখানেই । ফিরে যেতে হবে সেখানেই ।** আমরা সবাই এখন কম-বেশী কচ্ছপ ধূপের কোনো না কোনো জায়গায় আটকে আছি ; যে যতটা পুড়েছি , ঋদ্ধ হয়েছি আধ্যাত্মিক ভাবে -ততটা অবধি । যে প্রায় মাঝখানে পৌঁছে গেছে তার মোক্ষ হবো হবো । যে দূরে আছে সে এখনো অচেতন আছে । কেউ অনেকটা পুড়েছে, সে ঐশ্বরিকভাবে বিভোর । এইরকম । তবে ঐ মূল মহাশক্তির কাছে কিন্তু কেউ ফেল্না নয় । সবাই যাত্রী ; নানান পথের । এক একজনের যাত্রাপথ মসৃণ আবার কেউবা যাদের

আমরা পাপীতাপী বলি, তারা কাঁকর বিছানো পথের পথিক । সাহায্য চাইলে মহাশক্তি থেকে সৎ উপদেশ আসবেই । **পতিত উদ্ধারিনী গঙ্গের মতন ঐ মহাশক্তি । আমাদের স্রষ্টা । সবার জন্য উনি আছেন , সবসময় । তোমাকে শুধু যেতে হবে তাঁর দিকে !**

এদিকে কচ্ছপ ধূপের ওপরে সবাই পুড়ছে আর এটাই নিয়ম । কারণ ঐ যে মাঝখানটা সেটা তোমাকে টানছে । ভীষণভাবে টানছে আর তাই বিবর্তন হচ্ছে । এই আকর্ষণের নামই বিবর্তন বা ইভোলিউশান । আমাদের এই জন্ম মৃত্যুর খেলা বা নাচন কিছুদিনই চলবে । সবাইকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে ভেতরে নিয়ে চলে যাবে ঐ মহা ম্যাগনেট ; যাঁর পোষাকি নাম অরুণাচল ।

আমরা তো গডকে কেউ দেখিনি । হিন্দু ধর্মে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মুসলিম ধর্মে বা খ্রীস্ট ধর্মে একজনই গড ! কিন্তু কেন ?

ওদের গডি হলেন অরুণাচল বা ঐ মহা ম্যাগনেট ।

আর হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ?

ওরা ইসলামের বা যীশুপন্থীর ভাষায় হলেন অ্যাঞ্জেল ।

গডকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখা যায়না কিন্তু এই অ্যাঞ্জেলদের বা দেবদেবীদের দেখা সম্ভব। কেন ?

কারণ এরাও আমাদের মতন জীব কেবল উন্নত ও সুক্ষ্ম দেহের জীব। বসবাস অন্য জগতে।

তাই তাঁদের দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌কে দেখা যায় না কারণ উনি কোনো অবজেক্ট নন , সাবজেক্ট।

উনিই দেখছেন। উনিই সেই চেতনা যার মাধ্যমে আমরা দেখছি। তবুও তো তাঁকে দেখতে ভক্তের সাধ জাগে না কি ? তাই ভক্তের ডাকে ভগবান একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছেন এই জগতে। **অগ্নি লিঙ্গ বা অরুণাচলম্ পাহাড় রূপে দেখা দিয়েছেন পরম ব্রহ্ম। যাতে আমরাও স্থুল চোখে তাঁকে দেখে আশ্বাস পাই ও জপতপঃ করে মোক্ষের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই।**

এই পাহাড়কে বলা হয় ইচ্ছে প্রদানের ভান্ডার। যা কিছু মানুষ চায় তা এখানে এসে কিংবা মনে মনে চাইলেই **অরুণাচলের কাছে প্রার্থণা করে** তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায় মানুষ। যে কোনো বস্তু। পার্থিব বা অপার্থিব।

এই নিয়ে অনেক কাহিনী ও সত্য ঘটনা আছে।

শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রমের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও অন্যান্য মুণি-ঋষিদের আশ্রমে লেখা ; অজস্র ঋষিদের তপোবনে সমৃদ্ধ অরুণাচলের পাদদেশ ।

ঋষি অরবিন্দের আশ্রম কিংবা ভক্ত পরিচালিত একটি বিদেশী খাদ্যের কাফেও আছে এখানে ।

অরুণাচল পাহাড় খুবই শান্তির স্থল ।

রমণাশ্রমে ঢুকলে মনে হয়না যে কলিযুগে আছি । যেন কোনো সত্য যুগের মুণির আশ্রম ।

সেই ময়ূর, কেকা করছে । কুটিরে বসে ফ্রিতে খাবার খাও । পুষ্টিকর নিরামিষ খাবার ।

বৈদিক নিয়ম রীতি মেনে পুজো হচ্ছে । কোনো টাকাপয়সা চাইবার দৃষ্টিকটু প্রথা নেই । নেই কোনো গুরু টুরুর বালাই । নিজে বসে ধ্যান করো ঋষি অরবিন্দের আশ্রমের মতন আর ফিরে যাও নিজের কাজে ।আগে থেকে আশ্রমের রুম বুক করে আসতে হয় । ফ্রিতে থাকা যায় । আগে অনেকদিন থাকা যেতো । এখন কোভিডের পরে নিয়ম বদলে গেছে ।

এখন মহর্ষির বংশধর আশ্রম চালান । উনি আমেরিকায় চিকিৎসক ছিলেন । সব ত্যাগ করে

চলে এসেছেন আশ্রম চালাবার জন্য । মহর্ষি এরকমই নির্দেশ দিয়ে গেছেন ।

বলে গেছেন যে যারা সত্যকারের আধ্যাত্ম পথে যেতে আগ্রহী হবে তাদের জন্য এই আশ্রম চিরদিনই খোলা থাকবে ।

আর শীলমোহরের ছাপ দিয়ে কাগজপত্র করে দিয়ে গেছেন যাতে কোনো দুরাত্মা এসে মানুষকে বিরক্ত করতে না পারে ও আশ্রমের দখল নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে স্পিরিচুয়াল জার্নিতে বাধা না দিতে পারে । **পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সেই বাণী কে না জানি ? হেগো গুরুর , পেদো শিষ্য !**

কাজে কাজেই সাবধান আগে থেকেই ।

অরুণাচলে, আরেক মুণি ছিলেন মহর্ষির সময় তাঁর নাম ছিলো শেষাদ্রী স্বামীগল্ ।উনি ছিলেন এক আজব তপস্বী । গ্রামের বাজারে গিয়ে উনি মাঝে মাঝে দোকান থেকে জিনিস চুরি করে আনতেন । আর তারপরই সেই দোকানির বিরাট লাভ হতে শুরু করতো । এমনই ক্ষমতা ছিলো ওনার । তারপর দোকানি অপেক্ষা করতো কবে স্বামীজী আসেন আর দোকান থেকে জিনিস উঠিয়ে চলে যান

। এমনই মানুষের লোভ । নিজের স্পিরিচুয়াল উন্নতি না কামনা করে পার্থিব বস্তু চেয়ে বসতো ।

কথায় বলেনা , প্রদীপের নিচেই সবচেয়ে বেশি আঁধার ?

ঠিক তাই । এত পুণ্যভূমে থেকেও এই পাপিষ্ঠরা বুঝতে পারেনি যে কোথায় আছে তারা । কতটা ভাগ্যবান তারা । সারা বিশ্ব থেকে, এখানে মানুষ আসছে পুণ্য লাভের আশায় অথচ তারা চাইছে যে আদরের স্বামীজী এসে দোকান থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যান যাতে করে তাদের কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয় ।

এমনই মূর্খ এরা । হয়ত স্বামীজীর পাদস্পর্শে কোনো না কোনো জন্মে এদেরও মতিগতি ফিরবে ।

বুঝবে ; কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়না ।

এমনও জিনিস আছে জগতে যা অতি দূর্লভ আর সেই বস্তুই অতি সহজে ঈশ্বর তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু অবোধ তারা হেলায় হারিয়েছে সেই জিনিস আর আজ হাত পা ছুঁড়ে কাঁদলেও কোনো লাভ নেই । আবার মাটি খুঁড়ে জল বার করতে হবে আর এটাই তাদের ভবিতব্য । অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করা কিছু পার্থিব সুখে সুখী অপগন্ড মানুষজনের এই হল

দিবারাত্রির কাব্য । যেই পাহাড়ের কথা মনে মনে চিন্তা করলেই মোক্ষ হয় তার এত কাছে থেকেও এরা গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলো । তবে এরা আছে বলে বেঁচে আছে সৃষ্টি । নাহলে কবেই তো সব অসীমে মিলিয়ে যেতো ! তাই না ?

সেটাও একটু ভাবো ।

অনেকেই তো আছে যারা এই ধরায়, বারবার ফিরে আসতে চায়। সবুজ গ্রহতেই, এখানে নতুন আশায় - নিউক্লিয়ার ভোরে। অ্যাটম বোমার গুঁতো খেয়েও !

শ্রী রমণ মহর্ষি

শোনা যায় মোটামুটি ২.৬বিলিয়ন বৎসর বয়স, প্রাচীন এই অরুণাচল পাহাড়টির । ভূতাত্ত্বিকগণের মতে । এর আরো সুন্দর সুন্দর কয়েকটি নাম আছে।

যেমন সোনাচলম্, সোনাগিরি, অরুণাই, অরুণাগিরি আন্নামালাই ও অরুণাচলম্ । এর কাছেই অরুণাচলেশ্বরের মন্দির । এই মন্দিরের অধিপতি শিব বা অরুণাচলেশ্বর ।

এখানে হাতী পোষা হয় । সেই হাতী মানুষের মাথায় শূড় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে । দ্রাবিড় মানুষ খুব ধর্মপ্রাণ প্রজাতি । তারা সকালে উঠে, চট্ করে স্নান সেরে, ঘরদোর ধুয়ে ফেলে । তারপর ঈশ্বরে মনোনিবেশ করে । কেউ কেউ হয়ত হাতীর আশীর্বাদ নিয়ে দিন আরম্ভ করে । কপালে অনেকে তিলকের টিপ এঁকে নেয় । অনেকে সিঁদুরের টিপও পরে । কপালে চন্দন পরলে নাকি মাথা ঠান্ডা থাকে । দক্ষিণ ভারতে যেমন লাল ও সাদা চন্দন বন পাওয়া যায় সেরকম সবাই কপালে চন্দনের বড় বড় দাগ কেটে- তিলক পরে, মনকে শান্ত রাখতে । **যস্মিন দেশে যদাচার !** শ্রী রমণ মহর্ষি যেমন বলে গেছেন যে অরুণাচল পাহাড়ের প্রতিটি গাছ কল্পবৃক্ষ । আবার এই পাহাড়ের প্রতিটি শব্দ হল

পবিত্র , খাদ্য অমৃত । এখানে পরাব্রহ্মের- বিশ্বরূপ দর্শন সর্বদা পাওয়া যায় । জ্যোতির্লিঙ্গকে ঘিরে আছে অজস্র আলোর মালা কিংবা ঢেউ আর সেই ঢেউ হল গোলাকৃতি । এবং কচ্ছপ ধূপের মতন সেই ঊর্মিমালা গিয়ে এক এক করে মিশে যাচ্ছে ঐ ধূপের মাঝখানে- স্থায়ী এক শান্ত জ্যোতির স্তম্ভের মধ্যে ।

সাধকেরা ইচ্ছে করলেই এটা দেখতে সক্ষম হন এখানে । এই আশায় পুরাতন কাল থেকে বহু বড় বড় সন্ন্যাসীগণ এখানে পাড়ি জমান ; নানান স্থান থেকে-যেমন--সম্বন্দর, আপ্পার, মানিকাবাসাগর এবং সুন্দরর্ ইত্যাদি । বেদব্যাসও অরুণাচলের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন ।

অরুণাচল মাহাত্ম্য বইতে বলা আছে যে --

চিদম্বরম্ দেখলে, তিরুবারুরে জন্মালে, কাশীতে মৃত্যু হলে মোক্ষ হয় বলে বলা হয় কিন্তু অরুণাচলের কথা চিন্তা করলেই মোক্ষ হওয়া সম্ভব । আবার অন্য জায়গাতে বলা আছে যে এই পাহাড় আদতে আলোর পাহাড় । জ্যোতি দ্বারা সৃষ্ট । এবং একটি গুপ্ত তীর্থ । এটি হল পরমেশ্বরের হৃদয় ।

অন্যান্য পবিত্র তীর্থ সম্পর্কে রমণ মহর্ষি বলেছেন যে সেগুলি হল পরমেশ্বরের বাসস্থান । কিন্তু এটি হলেন পরমেশ্বর নিজে ।

যেমন কৈলাস হল শিবের বাড়ি কিন্তু এই পাহাড় শিব নিজেই । আর কেবল শিব কেন সমস্ত ধর্ম ও শক্তির উৎস হল এই অরুণাচল পাহাড়-- বলেই সাধু ও সন্তগণ মনে করে থাকেন । তাইতো আজও এখানে সিদ্ধপুরুষেরা বসবাস করেন ।

এইসব নিয়ে বহু গল্প আছে যা স্থানীয় মানুষের কাছে শুনতে পাওয়া যায় ।

এই পবিত্র পাহাড় অথবা পরমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করা হয় । মোট ১৪ কিলোমিটার তার দূরত্ব । পূর্ণিমার দিন, সকলে খালি পায়ে এই ১৪ কিলোমিটার পথ প্রদক্ষিণ করে থাকে তবে গাড়িতে কিংবা জুতো পরে গেলেও পুণ্য লাভ সম্ভব কারণ এই পাহাড় হল

হোমশিখার মতন । বিশ্বাস করে হাত দিলেও পুড়বে আর অবিশ্বাস করে দিলেও পুড়বে এবং তার ফল ভালই হবে । **কারণ হোমশিখায় থাকে অগ্নিমন্থের কাষ্ঠ ! মড়া পোড়ানোর কাঠ নয় !**

এই প্রদক্ষিণের পথে ৮টি লিঙ্গ আছে আর সেখানে মন্দির আছে। প্রতিটি ১২টি রাশির সাথে যুক্ত।

এই অষ্ট লিঙ্গের নামগুলি হল,

লিঙ্গ	রাশি	দিক্
ইন্দ্র লিঙ্গ	**বৃষ,তুলা**	পূর্ব
অগ্নি লিঙ্গ	**সিংহ**	দক্ষিণ-পূর্ব
যম লিঙ্গ	**বৃশ্চিক**	দক্ষিণ
নৈঋত লিঙ্গ	**মেষ**	দক্ষিণ-পশ্চিম
বরুণ লিঙ্গ	**মকর, কুম্ভ**	পশ্চিম
বায়ু লিঙ্গ	**কর্কট**	উত্তর-পশ্চিম
কুবের লিঙ্গ	**ধনু, মীন**	উত্তর
ঈশান্য লিঙ্গ	**মিথুন ,কন্যা**	উত্তর-পূর্ব

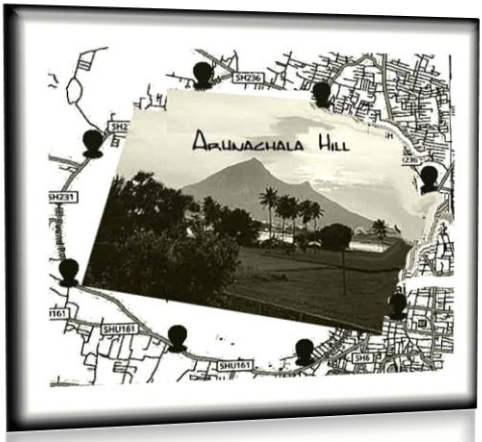

Eight lingams around the Arunachala Hill

চিত্র :: উইকিপিডিয়া--মডিফায়েড্

অরুণাচলকে লাল পাহাড়ও বলা হয়ে থাকে । এখানে আছে অজস্র ভেষজের ভান্ডার । এই ভেষজের ওপরে ভিত্তি করে অনেকে কবিরাজিও করে থাকে ও উপকৃত হয় । এখানে লেমনগ্রাসের উৎস দেখে স্থানীয় মানুষজন তা থেকে চা উৎপাদন করে খায় ও ঔষধি নির্মাণ করে থাকে ।

শ্রী মহর্ষিও এই পাহাড় থেকে শিকড় বাকর নিয়ে ঔষধি তৈরি করে দিতেন । উনি বলে গেছেন যে এই পাহাড়ে এমন কোনো অংশ নেই যার ওপরে আমার পা পড়েনি !

আগে বাঘ , ভাল্লুক , শেঁয়াল ইত্যাদি ছিলো এখন সেসব দেখা যায়না । প্রচুর গাছ কেটে ফেলায় ইদানিং বৃক্ষরোপন করা হচ্ছে ।

এই পাহাড়ের ঝর্ণা ও জলের নানান উৎসকে বলা হয় গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া । শীতল সেই বারির স্পর্শে সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে যায় । পথশ্রম ভুলে যায় ভক্তেরা ।

প্রতিবছর কার্ত্তিক মাসে এই পাহাড়ের চূড়াতে একটি আলোর প্রদীপ জ্বালানো হয় যাকে বলা হয় দীপম্ , স্থানীয় ভাষায় । অর্থাৎ দীপ ।

মোমবাতি । ঘি ও কর্পূরের সাহায্যে এই প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে । অরুণাচলেশ্বর মন্দির থেকে শিখা এনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় পাহাড়ের সর্বাপেক্ষা উঁচু চূড়ায় ; যখন সূর্য ডুবে যায় ও আকাশে গোলাকৃতি চাঁদ দেখা দেয় । নীচে রমণ আশ্রম থেকে **অরুণাচল শিবা** মন্ত্র ধ্বনি ভেসে আসে । এক পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় ।

অরুণাচলেশ্বর মন্দিরের ৬৬ মিটার উঁচু গোপুরম্ গুলি থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে আসে এই মন্ত্রের । আর ভেসে চলে কার্ত্তিগাই দীপম্ ,আবহমান কাল ধরে , মানব সমাজের মাঝে এক উল্লেখযোগ্য উপাসনার হেতু হয়ে ।

দ্রাবিড় সভ্যতায় দেখা যায় যে বেশিরভাগ মন্দিরে অনেক অনেক গোপুরম্ থাকে, প্রবেশ দ্বারগুলিতে । কেন থাকে তা বলতে সক্ষম হবেন ঐতিহাসিক ও মন্দির বিশারদগণ্ ; **গোপুরম্ হল মন্দিরের সবচেয়ে উচ্চ অংশ । সারা দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এইরকম স্থাপত্যর দেখা মেলে ।** অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরে পল্লব রাজবংশ প্রথমে অনেক গোপুরম্

তৈরি করেন পরে মন্দির সংস্কার হয় চোল, হয়সালা ও পান্ডিয়্য রাজাদের হাত ধরে । এখানে অপূর্ব সমস্ত কারুকার্য আছে । তবে সবথেকে বেশি ভালোলাগে থিরুভান্নামালাই শহরে শান্তির পরশ ।

এত মুণি-ঋষি বিভিন্ন সময় যেখানে বসবাস করে গেছেন , যাঁদের পদধূলিতে এই নগর- পবিত্র এক মখমলি চাদরে আবৃত আর সর্বোপরি যেই পুরাতন নগরের কিরীট স্বয়ং অরুণাচল তার কাছে ছুট্টে না গিয়ে আর ভালো না বেসে কেউ পারে ?

সুতরাং শিরিনের মনে হয়-- কেউ যদি বারবার এই ধরিত্রিতে ফিরে আসতে চাও তাহলে অরোভিলে গিয়ে ধ্যান করো , বিবর্তনের পথে এগিয়ে যাও আর সুন্দর করে তোলো এই সবুজ গ্রহকে । আর যদি না আসতে চাও মোটেই , মিশে যেতে চাও পরম ব্রহ্মে , ঘুম ঘুম ক্লাস রুম থেকে সোজা , আর স্কুলের গেট নয় , লাঞ্চ বক্স নয় , ক্লাস ফেলোর সাথে খুঁনসুটিও নয় সোজা নির্বাণ অথবা সুফি সন্তদের ফনা কোনো সাপের ফণা আর নয় কেবল শান্তি তাহলে অরুণাচলের কাছে চলে যাও । মনে মনে তাকে স্মরণ করলেই চির মুক্তি !

মহানির্বাণ, মোক্ষ, বুদ্ধ হয়ে যাওয়া অথবা একেবারে অরিহন্ত !!!

এত্তো সোজা নাকি ? প্রলয় । মহাপ্রলয় । কিসের অপেক্ষা ? কে বলেছে বিবর্তনের চাকা ধীরগতিতে চলেছে ?

মোক্ষেরও শর্টকাট আছে ; এই ফাস্টের যুগ-এ !

অরুণাচল পাহাড় দুই হাত বাড়িয়ে তোমাকে ডাকছেন ! গুপ্ত তীর্থ !

৬৩জন নয়নার (শৈব) ও আলওয়ার (বৈষ্ণব) সন্ন্যাসীগণ ভক্তি যোগে সাধনা করে যা পেয়েছেন ; অরুণাচল পাহাড় মুহূর্তেই তোমাকে তা দিতে সক্ষম । কিন্তু তুমি আসবে কি ?

এসো । অরুণাচলকে ভালোবাসো । যা চাইবে পাবে । পরীক্ষা করেই দেখো । আর শান্তি তো এমনিতেই পাবে এখানে । দেখে যাও নিজেই ।

হরি ওম্ তৎ সৎ ।

অরুণাচলেশ্বর মন্দির

“Yes I am, I am also a Muslim, a Christian, a Buddhist, and a Jew.”
— Mahatma Gandhi

Father of Nation .

Information taken from several books and websites , credit goes to them .

Images taken from websites

Credit goes to them.

THE END